বহুব্রীহি
হুমায়ূন আহমেদ

ভূমিকা

বহুব্রীহি নাম দিয়ে একটি টিভি সিরিয়েল লিখেছিলাম, এই বহুব্রীহিকে সেই টিভি সিরিয়েলের উপন্যাস রূপান্তর মনে করা ঠিক হবে না। আমি যা করেছি তা হচ্ছে মূল কাঠামো ঠিক রেখে একটা মজার উপন্যাস লেখার চেষ্টা। কিছু অন্য ধরনের কথা হাসি তামশার মাঝখানে আছে। আশা ক'রছি সেই সব কথা রঙ্গ রসিকতায় পুরোপুরি ঢাকা পড়বে না। কিছু না কিছু থেকেই যাবে।

পাঠক পাঠিকাদের আমার এই উপন্যাস টিভি সিরিয়েলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে হোঁচট খাবেন। সেই চেষ্টা না করাই ভাল।

এই লেখাটি আমি গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে লিখেছি সেই আনন্দের ভগ্নাংশও যদি পাঠক পাঠিকাদের কাছে পৌছাতে পারি তাহলেই আমার সকল শ্রম স্বার্থক হয়েছে ধরে নেব।

হুমায়ূন আহমেদ
৩/৮/৯০
শহীদুল্লাহ হল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উঁচু দেয়ালে ঘেরা পুরানো ধরণের বিশাল দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে এবং পেছনে গাছ গাছালিতে জঙ্গলের মত হয়ে আছে। কিছু কিছু গাছের গুড়ি কালো সিমেন্টে বাঁধানো। বাড়ির নাম নিরিবিলি, শ্বেত পাথরে গেটের উপর নাম লেখা, অবশ্যি 'র' এর ফোটা মুছে গেছে। পাড়ার কোন দুষ্ট ছেলে হারিয়ে যাওয়া ফোটাটা বসিয়ে দিয়েছে 'ব' এর উপর। এখন বাড়ির নাম 'নিবিরিলি'।

সাধারণত যে সব বাড়ির নাম 'নিরিবিলি' হয়, সেসব বাড়িতে সারাক্ষণই হৈ চৈ হতে থাকে। এই মুহূর্তে এ বাড়িতে অবশ্যি কোন হৈ চৈ হচ্ছে না। বাড়ির প্রধান ব্যক্তি সোবাহান সাহেবকে বারান্দার ইজি চেয়ারে পা মেলে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। চোখে সুস্পষ্ট বিরক্তি।

সোবাহান সাহেব বছর দুই হল ওকালতি থেকে অবসর নিয়েছেন। কর্মহীন জীবনে এখনো অভ্যস্ত হতে পারেন নি। দিনের শুরুতেই তাঁর মনে হয় সারাটা দিন কিছুই করার নেই। তাঁর মেজাজ সেই কারণে ভোরবেলায় খুবই খারাপ থাকে। আজ অন্য দিনের চেয়েও বেশি খারাপ, কেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। শরৎকালের একটা চমৎকার সকাল। ঝকঝকে রোদ, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। এ রকম একটা সকালে মন খারাপ থাকার প্রশ্নই আসে না।

সোবাহান সাহেবের গায়ে হলুদ রঙের একটা সূতির চাদর। গলায় বেগুনী রঙের মাফলার। আবহাওয়া বেশ গরম, তবু তিনি কেন যে মাফলার জড়িয়ে আছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর হাতে একটা পেপার ব্যাক, ডিটেকটিভ গল্প। কাল রাতে বত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছিলেন। গত এক ঘন্টা ধরে তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা পড়তে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বার বার ইচ্ছে করছে বই ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে। তেত্রিশ পৃষ্ঠায় নেইল কাটার দিয়ে খুঁচিয়ে স্মীথ নামে একটি লোকের বাঁ চোখ তুলে নেবার বিষদ বর্ণনা আছে। সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে পড়লেন—চোখ উপড়ে তুলে নেবার সময়ও মিঃ স্মীথ রসিকতা করছে এবং গুন গুন করে গাইছে—লন্ডন ব্রীজ ইজ ফলিং ডাউন।

কোন মানে হয়? যে লেখক এই বইটি লিখেছে সোবাহান সাহেবের ইচ্ছে করছে তার বাঁ চোখটা নেইল কাটার দিয়ে তুলে ফেলতে।

সোবাহান সাহেবের ছোট মেয়ে মিলি চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় ঢুকল। বাবার সামনের গোল টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসিমুখে বলল, বাবা তোমার চা।

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, কিসের চা?

'চা পাতায় তৈরী চা, আবার কিসের?'

'এখন কেন?'

'তুমি সকাল আটটায় এক কাপ চা খাও এই জন্যে এখন। সকাল আটটা কিছুক্ষণ আগে বাজল।'

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, পিরিচে চা পড়ে আছে কেন? চা থাকবে চায়ের কাপে।

'তাই আছে বাবা, পিরিচে এক ফোঁটা চা নেই। তুমি ভাল করে তাকিয়ে দেখ।'

তিনি চায়ের কাপ হাতে নিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন চা অতিরিক্ত মিষ্টি হলে বা মিষ্টি কম হলে মেয়েকে প্রচণ্ড ধমক দেবেন। কাউকে ধমকাতে ইচ্ছা করছে। তিনি অত্যন্ত মনমরা হয়ে লক্ষ্য করলেন, চা-য়ে চিনি ঠিকই আছে। চা আনতে আনতে ঠাণ্ডাও হয় নি, যতটুকু গরম থাকার কথা ততটুকুই আছে, বেশিও না কমও না।

মিলি বলল, সব ঠিক আছে বাবা?

তিনি জবাব দিলেন না। মিলি হালকা গলায় বলল, ভোরবেলা তোমার জন্যে চা আনতে যা ভয় লাগে। একটা না একটা খুঁত ধরে বিশ্রী করে বকা দাও। বাবা, তোমার পাশে খানিকক্ষণ বসব?

সোবাহান সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মিলি, গোল-টেবিলের এক কোণায় বসল। তার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্যে সে ঝলমল করছে। তার পরনে কমলা রঙের শাড়ি। শরৎকালের ভোরের সঙ্গে এই শাড়িটি চমৎকার মানিয়ে গেছে। মিলি হাসিমুখে বলল, এই গরমে গলায় মাফলার জড়িয়ে আছ কেন বাবা? দাও খুলে দেই।

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, খোলার প্রয়োজন মনে করলে নিজেই খুলতাম। মাফলার খোলা খুব জটিল কোন বিষয় নয় যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য লাগবে।

মিলি হেসে ফেলল। হেসেই চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল, বাবা তার হাসি দেখতে পেলে রেগে যেতে পারেন। মিলি মুখের হাসি মুছে বাবার দিকে তাকাল। হাসি অবশ্যি পুরোপুরি গেল না-তার চোখে ঝিলমিল করতে লাগল।

'বাবা, রোজ ভোরে তুমি একটা ঝগড়া বাধাতে চাও কেন বলতো? ভোরবেলা তোমার ভয়ে আমি অস্থির হয়ে থাকি।'

এই বলে মিলি আবার হেসে ফেলল। এখন তার হাসি দেখে মনে হল না বাবার ভয়ে সে অস্থির। সোবাহান সাহেব কিছুই বললেন না। বই খুললেন, তেত্রিশ পৃষ্ঠাটা পড়ার একটা শেষ চেষ্টা করা যাক।

মিলি বলল, তুমি মার্ডার ইন দা ডার্ক পড়ছ? অসাধারণ একটা বই-তাই না বাবা?

সোবাহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, অসাধারণ ?

'হ্যাঁ অসাধারণ, স্মীথ নামের একটা লোকের বাঁ চোখ নেইল কাটার দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলা হয় . . .'

'এটা অসাধারণ?'

'লোকটার সাহস তুমি দেখবে না? লোকটা তখন গান গাইতে থাকে-লন্ডন ব্রীজ ইজ ফলিং ডাউন, ফলিং ডাউন . . .। তারপর কি হয় জান? এই অবস্থায় সে কৌক করে একটা লাথি বসায় মার্ডারারটার পেটে। মার্ডারার এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হতেই সে উপড়ে তোলা চোখটা ছিনিয়ে তিনতলার জানালা দিয়ে নীচে লাফ দেয়। তার চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। তীব্র ব্যথায় সে দিশাহারা, তবু সে ছুটে যায় একটা হাসপাতালে, ডাক্তারকে হাসি মুখে বলে-ডাক্তার সাহেব আপনি কি এই চোখটা জায়গামত বসিয়ে দিতে পারেন? যদি পারেন তাহলে আপনাকে আমি লন্ডন শহরের সবচে বড় গোলাপটি উপহার দেব। সৌভাগ্য ক্রমে সেই হাসপাতালে তখন ছিলেন ইউরোপের সবচে বড় আই সার্জন ডঃ এসিল নায়ার। তিনি-'

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সে লোকটার চোখ লাগিয়ে দিল?

'হ্যাঁ অপটিক নার্ভ গুলি জোড়া লাগিয়ে দিল-'

'এই কুৎসিত বইটাকে তুই বলছিস অসাধারণ? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী যে ইকনমিক্সে অনার্স পড়ছে সে এই বইকে বলছে অসাধারণ?'

'ইকনমিক্সে অনার্স পড়লে থ্রিলার পড়া যাবে না?'

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, বইটা আমার সামনে ছিড়ে কুটি কুটি কর।

'কি বললে বাবা?'

'বইটা কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেল, আমি দেখি।'

মিলি আঁৎকে উঠে বলল, এই বই আমার না বাবা। আমার এক বান্ধবীর বই। আমি এক সপ্তার জন্যে ধার এনেছি।

'বই যারই হোক–নষ্ট করা দরকার। সমাজের মঙ্গলের জন্যেই দরকার। আমি এই বিষয়ে দ্বিতীয় কোন কথা শুনতে চাই না। আমি দেখতে চাই যে বইটা কুটি কুটি করে ফেলা হয়েছে।'

'আমার বইতো না বাবা। আমার বই হলে একটা কথা ছিল।'

'বললাম তো এই বিষয়ে আমি আর কোন আর্গুমেন্ট শুনতে চাই না। ডেষ্টয়।'

মিলি বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব ভঙ্গিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল, কেঁদে ফেলার চেষ্টা করল, কাঁদতে পারল না। কেঁদে ফেলতে পারলে বইটা রক্ষা করা যেত। সোবাহান সাহেব বললেন, কি ব্যাপার বসে আছিস যে? কি বলছি কানে যাচ্ছে না?

মিলি উঠে দাঁড়াল। বাবার কোল থেকে বই নিয়ে ছিড়ে কুচি কুচি করে ফেলল। এই সময় তার চোখে পানি এসে গেল। মিলি জানে চোখের পানি দেখা মাত্র তার বাবার মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যায়। এখন ঠান্ডা হলেই বা লাভ কি? সর্বনাশ যা হবার তাতো হয়েই গেছে। ছেড়া বইতো আর জোড়া লাগবে না। মৌসুমীকে সে কি জবাব দেবে তাই ভেবে মিলির চোখ আবার জলে ভরে উঠছে। সে ছেড়া বই চারিদিকে ছড়িয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দায় ঢুকল ফরিদ।

ফরিদ, মিলির মামা। সাত বছর বয়স থেকে এই বাড়িতেই আছে। পাঁচ বছর আগে অংকে অনার্স পাশ করেছে। এম, এ করেনি কারণ তার ধারণা তাকে পড়াবার মত বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেই। এম, এ পড়া মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট। বর্তমানে তার দিন কাটছে ঘুমিয়ে। অল্প যে কিছু সময় সে জেগে থাকে সেই সময়টায় সে ছবি দেখে। অধিকাংশই আর্ট ফ্লিম। কোন কোন ছবি ছ'সাতবার করেও দেখা হয়। বাকি জীবনটা সে এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে চায় কি–না জিজ্ঞেস করলে অত্যন্ত উচ্চ মার্গের একটা হাসি দেয়। সেই হাসি অতি মধুর, তবু কেন জানি সোবাহান সাহেবের গা জ্বলে যায়। ইদানীং ফরিদকে দেখা মাত্র তাঁর ব্রহ্মতালু গরম হয়ে উঠে, ঘাম হয়। আজও হল। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আগেকার আমলের মুনি ঋষিরা হয়ত এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্টদের ভস্ম করে দিতেন। ফরিদ তার দুলাভাইয়ের দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল,

What a lovely day.

ফরিদের খালি গা। কাঁধে একটা টাওয়েল। মুখ ভর্তি টুথপেষ্টের ফেনা। কথা বলতে গিয়ে ফেনা তার গায়ে পড়ে গেল এতে তার মুগ্ধ বিস্ময়ের হের ফের হল না। সে আনন্দিত স্বরে বলল, দুলাভাই শরৎকালের এই শোভার কোন তুলনা হয় না। অপূর্ব! অপূর্ব! আমার মনটা দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে দুলাভাই। I am dissolving in the nature.

সোবাহান সাহেব মেঘ গর্জন করলেন, ফরিদ এসব কি হচ্ছে আমি কি জানতে পারি?

'নেচারকে এপ্রিসিয়েট করছি দুলাভাই। নেচারকে এপ্রিসিয়েট করায় নিশ্চয়ই কোন বাধা নেই।'

'টুথপেস্টের ফেনায় সারা গা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে সেই খেয়াল আছে?'

'তাতে কিছু যায় আসে না দুলাভাই।'

'যায় আসে না?'

'না।'

'খালি গায়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ, রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে তাতেও তোমার অসুবিধা হচ্ছে না?'

'জ্বি না। পোষাক হচ্ছে একটা বাহুল্য।'

'পোষাক একটা বাহুল্য?'

'জ্বি। আমি যখন খালি গা থাকি তখন প্রকৃতির কাছাকাছি থাকি। কারণ প্রকৃতি যখন আমাদের পাঠান তখন খালি গায়েই পাঠায়। এই যে আপনি জাব্বা জোব্বা পরে বসে আছেন এইসব খুলে পুরো দিগম্বর হয়ে যান দেখবেন অন্য রকম ফিলিংস আসবে।'

স্তম্ভিত সোবাহান সাহেব বললেন, তুমি আমাকে সব কাপড় খুলে ফেলতে বলছ?

'জ্বি বলছি।'

সোবাহান সাহেব লক্ষ্য করলেন তাঁর ব্রহ্মতালুতে জ্বলুনী শুরু হয়েছে, গা ঘামছে। এসব হার্ট এ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ কিনা কে জানে। তাঁর মৃত্যু হার্ট এ্যাটাকে হবে এটা তিনি বুঝতে পারছেন, ফরিদের কারণেই হবে। কত অবলীলায় কথাগুলি বলে কেমন হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ফরিদ বলল, আপনি চোখ মুখ এমন শক্ত করে বসে আছেন কেন দুলাভাই? আনন্দ করুন।

'আনন্দ করব?'

'হ্যাঁ করবেন। জীবনের মূল জিনিসই হচ্ছে আনন্দ। এমন চমৎকার একটা সকাল। আচ্ছা দুলাভাই রবি ঠাকুরের ঐ গানটার কথাগুলি আপনার মনে আছে—আজি এ শারদ প্রভাতে— মনে আছে?' প্রথম লাইনটা কি—আজি এ শারদ প্রভাতে, না—কি হেরিনু শারদ প্রভাতে?'

সোবাহান সাহেব বললেন, তুমি দয়া করে আমার সামনে আসবে না।

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

'আবার কথা বলে, যাও বলছি আমার সামনে থেকে। বহিষ্কার, বহিষ্কার।'

'কি যন্ত্রণা আবার সাধু ভাষা ধরলেন কেন? বহিষ্কার আবার কি? বলুন বেড়িয়ে যাও। মুখের ভাষাকে আমাদের সহজ করতে হবে। দুলাভাই, তৎসম শব্দ যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।'

'যাও বলছি আমার সামনে থেকে। যাও বলছি।'

'যাচ্ছি। যাচ্ছি। বিনা কারণে আপনি এ রকম রেগে যান কেন এই ব্যাপারটাই আমি বুঝি না।'

ফরিদ চিন্তিত মুখে ঘরের ভেতর ঢুকল। সোবাহান সাহেবের স্ত্রী তার কিছুক্ষণ পর বারান্দায় এসে বললেন, তুমি কি মিলিকে কিছু বলেছ? ও কাঁদছে কেন?

সোবাহান সাহেবের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, একুশ বছর বয়েসী একটা মেয়ে যদি কথায় কথায় কেঁদে ফেলে তাহলে বুঝতে হবে দেশের নারী সমাজের চরম দুর্দিন যাচ্ছে।

'কথা বলছ না কেন, কিছু বলেছ মিলিকে? মেয়ে বড় হয়েছে এখন যদি রাগারাগি কর।—'

সোবাহান সাহেব শীতল গলায় বললেন, মিনু তোমাকে এখন একটা কঠিন কথা বলব, মন দিয়ে শোন–আমি তোমাদের সংসারে আর থাকব না।

'তার মানে, কোথায় যাবে তুমি?'

'সেটা এখনো ঠিক করিনি। আজ দিনের মধ্যে ঠিক করব।'

মিনু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। সোবাহান সাহেব বললেন, একটা অপ্রিয় ডিসিসান নিলাম। বাধ্য হয়েই নিলাম।

'বনে জঙ্গলে গিয়ে সাধু সন্ন্যাসী হবে?'

'এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না।'

সোবাহান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মিনু বললেন, যাচ্ছ কোথায়?

তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। অতি দ্রুত গেট খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার ওপাশেই এখন একটা মাইক ভাড়ার দোকান হয়েছে। সারাক্ষণ সেখান থেকে "হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং–ওয়ান–টু–থ্রী। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং–ওয়ান–টু–থ্রী হয়।" এখন হচ্ছে না। এখন তারা একটা রেকর্ড বাজাচ্ছে–"হাওয়া মে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল।" এই লক্ষ কোটি বার শোনা গান শুনে মেজাজ আরো খারাপ হবার কথা, তা হল না। সোবাহান সাহেব লক্ষ্য করলেন–গানটা শুনতে তাঁর ভাল লাগছে। তিনি এর কারণ বুঝতে পারলেন না। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশ ঘন নীল, নীল আকাশে সাদা মেঘের স্তূপ। আকাশ এবং মেঘ দেখতেও তাঁর ভাল লাগল। তাঁর মনে হল–মানব জীবন বড়ই মধুর। এই জীবনের আনন্দ হেলা ফেলার বিষয় নয়।

২

'মানব জীবন বড়ই মধুর' এই কথা সবার জন্যে সম্ভবত প্রযোজ্য নয়। গ্রীন ফার্মেসীর নতুন ডাক্তার মনসুর আহমেদের জন্যে তো অবশ্যই নয়। তার কাছে মনে হচ্ছে–মানব জীবন অর্থহীন যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম মনে করার আপাত দৃষ্টিতে তেমন কোন কারণ নেই। সে মাত্র ছ'মাস আগে ইন্টার্নীশীপ শেষ করে বের হয়েছে। এর মধ্যেই ভোলা উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটা চাকরিও পেয়েছে। ঢাকা ছেড়ে যাবার ইচ্ছা নেই বলে ঐ চাকরি সে নেয়নি। আপাতত সে গ্রীণ ফার্মেসীতে বসছে। গ্রীণ ফার্মেসীর মালিক কুদ্দুস সাহেব তাকে ফার্মেসীর উপরে দু'টি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। মনসুর ঐ ঘর দু'টিতে সংসার পেতে বসেছে। প্রতিদিন কিছু রুগী টুগীও পাচ্ছে। বড় কিছু না–সর্দি জ্বর, কাশি, ডায়রিয়া। একদিন অল্পবয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে মেয়ের মা এসেছিলেন, চেংড়া ডাক্তার দেখে মেয়ের অসুখ প্রসঙ্গে কিছু বললেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, না থাক আপনাকে দেখতে হবে না। আমার দরকার একজন বয়স্ক ডাক্তার। আপনি তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে।

কুদ্দুস সাহেব বললেন, ডাক্তারদের কোন বয়স নেই আপা। ডাক্তার হচ্ছে ডাক্তার। আর এর বয়স কম হলে কি হবে জাত–সাপ।

জাত সাপের প্রতি রুগী বা রুগীনির মা কারোরই কোন আগ্রহ দেখা গেল না। রুগীনি বলল, আমি উনাকে কিছু বলব না মা।

এ রকম দু' একটা কেইস বাদ দিলে রুগী যে খুব খারাপ হচ্ছে তাও না। ভিজিটের টাকা চাইতে মনসুরের লজ্জা করে। ঐ দায়িত্ব কুদ্দুস সাহেব খুব ভাল ভাবেই পালন করছেন।

'দশ টাকা কি দিচ্ছেন ভাই? উনার ভিজিট কুড়ি টাকা। বয়স কম বলে অশ্রদ্ধা করবেন না-গোল্ড মেডালিষ্ট।'

মনসুর বিব্রত গলায় বলেছে, কুদ্দুস ভাই, সব সময় গোল্ড মেডেলের কথা বলেন। কোন মেডেল ফেডেল তো আমি পাই নি।

কুদ্দুস সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছেন, পাওয়ার দরকার নেই। মানুষের মুখেই জয়। মানুষের মুখেই ক্ষয়। মুখে মুখে মেডেলের কথাটা রটে যাক। স্যুটকেস খুলে কেউতো আর মেডেল দেখতে আসবে না।

'এইসব মিথ্যা কথা বলে লাভ কি?'

'নাম ফাটবেরে ভাই নাম ফাটবে। তোমার নাম ফাটা মানে ফার্মেসীর উন্নতি। ফার্মেসীর উপর বেঁচে আছি। ফার্মেসীর উন্নতি দেখতে হবে না?'

কুদ্দুস সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফার্মেসীতে বসে থাকেন। সারাক্ষণ কথা বলেন। মানুষটাকে মনসুরের বেশ ভাল লাগে। তাঁর বকবকানি এবং উপদেশ শুনতেও মনসুরের খারাপ লাগে না।

'তোমার সবই ভাল বুঝলে ডাক্তার, তবে তোমার একটা বড় সমস্যা কি জান? তোমার কোন উচ্চাশা নেই।'

'সেটা সমস্যা হবে কেন?'

'এইটাই সবচে বড় সমস্যা। দু' ধরনের মানুষের উচ্চাশা থাকে না, মহাপুরুষদের এবং বেকুবদের। তুমি এই দু'দলের কোন দলে সেটা বুঝতে পারছি না। সম্ভবত দ্বিতীয় দলে।'

'আমাকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই।'

'দরকার থাকবে না কেন, অবশ্যই আছে। এ রকম ইয়াং একজন ছেলে-গোল্ড মেডালিষ্ট, অথচ তার কোন উচ্চাশা নেই-'

'কি মুশকিল গোল্ড মেডেলের কথা আবার বলছেন।'

'ঐ একই হল। পেতেও তো পারতে। আমি যা বলছি তার সারমর্ম হচ্ছে-সুযোগ খুঁজতে হবে। বিলেত আমেরিকা যেতে হবে, এফ আর সি এস, এম আর সি পি হয়ে এসে রুগীদের গলা কেটে পয়সা করতে হবে। আলিশান দালান তুলতে হবে--'

'আমার এত সব দরকার নেই। আমি সুখেই আছি।'

'সুখে আছ?'

'হ্যাঁ সুখে।'

মনসুর আসলেই সুখে আছে। তার উপর সংসারের দায় দায়িত্ব কিছু নেই। তার বাবা ময়মনসিংহ শহরে ওকালতী করেন। দেশের বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। ময়মনসিংহের এত বড় বাড়িতে মানুষ বলতে বাবা-মা এবং ছোট বোন নীলিমা। মনসুরকে টাকা রোজগার করে সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। উল্টা প্রতিমাসে মনসুরের বাবা এক হাজার করে টাকা পাঠিয়ে ছোট একটা চিঠি লিখেন। প্রতিটি চিঠির ভাষা এবং বক্তব্য এক।

বাবা মনু,

টাকা পাঠালাম। শরীরের যত্ন নেবে। তুমি ঢাকা শহরে কেন পড়ে আছ তা বুঝতে পারছি না। তোমার নিজের শহরে প্র্যাকটিস করতে অসুবিধা কি? একটা ভাল

জায়গায় তোমার জন্য চেষ্টার করে দেবার সামর্থ পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা আমাকে দিয়েছেন। পত্রপাঠ মন স্থির করে আমাকে জানাবে।

–ইতি তোমার আব্বা।

পুনশ্চ ১ঃ আরো টাকার দরকার হলে লিখবে। এই নিয়ে সংকোচ করবে না। টাকা পয়সা তোমাদের জন্যেই।

পুনশ্চ ২ঃ তোমার মার ইচ্ছা তোমার একটি বিবাহ দেন। ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমার এখন পঁচিশ চলছে। আমি চব্বিশ বছর বয়সে তোমার মাকে বিবাহ করি। বিবাহের জন্যে এটাই উপযুক্ত বয়স।

পুনশ্চ ৩ঃ তোমার নিজের কোন পছন্দ থাকলে আমাদের কোনই আপত্তি নাই, এটা তোমাকে বলে রাখলাম।

বাবার চিঠির সঙ্গে মা'র চিঠি থাকে। সেই চিঠিতে নানান অবান্তর কথার সঙ্গে একটি মেয়ের কথা থাকে। পুরো চিঠি জুড়ে থাকে সেই মেয়ের রূপ এবং গুণের বর্ণনা, এবং সেই রূপবতী এবং গুণবতীর কয়েকটি রঙ্গীন ছবি।

গত সপ্তাহের চিঠিতে যে মেয়ের কথা ছিল তার নাম রূপা।

মনসুরের মা লিখেছেন–

বাবা মনু, এই মেয়েটির দিকে একবার তাকাইলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। বড়ই রূপবতী মেয়ে। আচার ব্যবহারেও চমৎকার। এই সবই হয়েছে বংশের গুণ। মেয়ের মাতুল বংশ খুবই উচ্চ। নান্দাইল রোডের সরদার পরিবার। এক ডাকে সবাই চিনে। মেয়ে মমিনুন্নেসা কলেজে বি এ ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। মেট্রিক ফার্ষ্ট ডিভিসন এবং জেনারেল অংকে লেটার পেয়েছিল। অসুখ নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়ায় ফল বেশী ভাল হয় নাই। মেয়ে খুব ভাল গান গায়। কলেজের সব ফাংশানে নজরুল গীতি গায় এবং খুব প্রশংসা পায়। মেয়ের তিনটি ছবি পাঠালাম। তোমার পছন্দ হলে আরো কথা বার্তা বলব।

চিঠির সঙ্গে খুব সেজেগুজে তোলা তিনটা ছবি। একটা ছবিতে সে টেলিফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলছে। একটায় অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে অর্থাৎ ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য ছবিটা ফুলের বাগানে তোলা। আউট অব ফোকাস হওয়ায় মেয়েটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, ফুলগুলি বড় সুন্দর এসেছে।

এইসব চিঠি এবং চিঠির সঙ্গে ছবি পেতে মনসুরের মন্দ লাগে না। ভালই লাগে। কোন এক লজ্জাবনত তরুনীর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে এই কল্পনাও তার কাছে মধুর বলে মনে হয়।

গ্রীন ফার্মেসীর জীবন এবং তার সঙ্গে মধুর কিছু কল্পনায় তার সময় ভালই কাটছিল। একটা মেয়ে হঠাৎ করে এসে সব এলোমেলো করে দিল। ঐ মেয়েটার কারণে ক'দিন ধরেই মনসুরের মনে হচ্ছে–মানব জীবন একটা যন্ত্রণা বিশেষ। তার রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না। হজমের অসুবিধা হচ্ছে। ঘটনাটা এ রকম–

গত বুধবারে খুব মেঘলা ছিল। দুপুরে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। কুদ্দুস সাহেব ভাত খেতে গেছেন। দোকানের এক কর্মচারী মজনু বলল, স্যার আপনি একটু বসেন আমি লন্ড্রী থেকে কাপড় নিয়ে আসি। মনসুর বলল, যাও আমি আছি। মজনু চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে এসে ঢুকল। পরণে সাধারণ নীল রঙের একটা শাড়ি। মাথার চুল খোপা করা। খোপা ভাল করে করা হয়নি–চুল এলোমেলো হয়ে আছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়েই মনসুরের কেমন যেন লাগতে লাগল। এমন সুন্দর মানুষ এই পৃথিবীতে আছে? ছেলেবেলার রূপকথার বই–এ যে সব বন্দিনী রাজকন্যার ছবি থাকে এই মেয়ে তারচেয়েও লক্ষগুণ সুন্দর। কেমন

মায়া মায়া চোখ, সমস্ত চেহারায় কি অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ ভাব। মেয়েটা এত সুন্দর যে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত মনসুরের কষ্ট হচ্ছে।

মেয়েটা নরম স্বরে বলল, আপনাদের কাছে স্যাভলন বা ডেটল জাতীয় কিছু আছে?

মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, জ্বি আছে।

'মাজারি সাইজের একটা ফাইল দিন।'

'এক্ষুণী দিচ্ছি। আপনি বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন।'

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল, বসতে হবে কেন? জিনিসটা দিন চলে যাই। দাম কত?

মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, দাম লাগবে না।

মেয়েটি আরো অবাক হয়ে বলল, দাম লাগবে না কেন?

'না মানে কোম্পানী থেকে আমরা অনেক স্যাম্পল ফাইল পাইতো–এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল ফাইল।'

মেয়েটি বিরক্ত গলায় বলল, স্যাম্পল ফাইল আমাকে দেবার দরকার নেই অন্য কাউকে দেবেন। দাম কত বলুন।

'দামতো আমি জানি না।'

'দাম জানেন না মানে?'

'আমাদের কর্মচারী লন্ড্রীতে গেছে। ও সব জানে। এক্ষুণী এসে পড়বে।'

'আপনি তাহলে কে?'

'আমি ডাক্তার। মানে এই ফার্মেসীতে বসি। সকাল বিকাল দু'বেলাই থাকি। আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন।'

'বসতে পারব না আমার তাড়া আছে। আমার মা বটিতে হাত কেটে ফেলেছেন। হাতে ডেটল দিতে হবে।'

মনসুর অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে বলল, চলুন যাই ড্রেস করে দিয়ে আসি। কাটা ছেড়া ছোট হলেও একে অবহেলা করা ঠিক না। সেপটিক হয়ে যেতে পারে।

মেয়েটি খুবই অবাক হল। কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকাতে লাগল। শান্ত গলায় বলল, মা'র হাতের কাটা এমন কিছু না।

মজনু এই সময় ফিরে এল। মেয়েটা টাকা দিয়ে স্যাভলনের শিশি হাতে নিয়ে চলে গেল। মনসুরের সারাটা দিন আর কোন কাজে মন বসল না। আশ্চর্যের ব্যাপার সেই রাতে সে ঘুমুতে পারল না। একটা মেয়েকে একবার দেখে কারোর এমন হয়?

দ্বিতীয় দিনে মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা। বই খাতা নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়ে মনসুর বের হয়েছিল সিগারেট কিনতে। মনসুর জীবনে যা কোনদিন করেনি তাই করল, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার মা ভাল আছেন?

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে বলছেন?

মনসুর থতমত খেয়ে বলল, জ্বি।

'আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।'

'আমি গ্রীণ ফার্মেসীতে বসি। ডাক্তার। আপনি এক বোতল স্যাভলন কিনে নিয়ে গেলেন। আপনার মা'র হাত কেটে গিয়েছিল।'

'ও আচ্ছা মনে পড়েছে। মা ভাল আছেন। আমি এখন যাই, কেমন?'

মেয়েটি তাকে চিনতে পারল না এই দুঃখে দ্বিতীয় রাতেও মনসুরের ঘুম এল না। দু'টি সিডাকসিন খেয়েও সে সারা রাত জেগে কাটাল। মেয়েটির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সে এখন

জানে। তার নাম মিলি। ভাল নাম ইয়াসমীন। ইকনমিক্সে অনার্স পড়ে–সেকেন্ড ইয়ার। যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির নাম নিরিবিলি। বাড়ির গেটে একটা সাইনবোর্ড ঝুলে, সেখানে লেখা–কুকুর হইতে সাবধান। যদিও সে বাড়িতে কুকুর নেই। মেয়েটি বিকেলে বাড়ির ছাদে একা হাঁটাহাটি করে। সে ইউনিভার্সিটিতে যায় সকাল আটটায়। রাস্তার মোড় পর্যন্ত হেঁটে যায়। তারপর রিকশা নেয়। রিকশার হুড তুলে না। সব সময় শাড়ি পরে। মেয়েটার নিশ্চয়ই অনেক শাড়ি। এখন পর্যন্ত এক শাড়ি দু'বার পরতে মনসুর দেখেনি। মেয়েটি ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরে। অবশ্যি সে বেশ লম্বা, হিল পরবার তার প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি তাকে চিনতে পারে কি–না এটা পরীক্ষা করবার জন্যে আজ সকালে সে মেয়েটার ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় সামনাসামনি পরে গেল। মেয়েটি চোখ তুলে তাকে দেখল। মনসুর কাঁপা গলায় বলল, ভাল আছেন?

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, আমাকে বলছেন?

মেয়েটির চোখে অপরিচিতের দৃষ্টি। লজ্জায় এবং দুঃখে মনসুরের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আর তখন মেয়েটি বলল, ও আচ্ছা আপনি গ্রীণ ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেব। জ্বি আমি ভাল।

মনসুর হড়বড় করে বলল, আপনার মায়ের সেই কাটাটা কি সেরেছে?

মেয়েটি এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। তারপর আর কোন কথা না বলে রিকশায় উঠে গেল। রাগে এবং লজ্জায় মনসুরের ইচ্ছা করল লাইট পোষ্টে নিজের মাথা সজোরে ঠুকে দেয়। কেন সে বোকার মত তার মা'র হাত কাটার কথা জিজ্ঞেস করল? মেয়েটি নিশ্চয়ই তার বোকামী নিয়ে মনে মনে হাসছে। কে জানে বাড়িতে গিয়ে তার মাকেও হয়ত বলবে। কি লজ্জা। কি লজ্জা।

কুদ্দুস সাহেব বললেন, তোমার কি হয়েছে মনসুর বল তো।

'কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি বললে তো আমি বিশ্বাস করব না। কিছু একটা হয়েছে তো বটেই–রাতে ঘুম হয়?'

'ঘুমের একটু অসুবিধা হচ্ছে?'

'বদ হজমও হচ্ছে তাই না?'

'জ্বি।'

'মনে হচ্ছে পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা–ঠিক না?'

'জ্বি।'

'সবই খুব পরিচিত লক্ষণ। আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি তখন আমার মধ্যে এইসব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। এটা একটা জীবাণু ঘটিত অসুখ।'

'মনসুর অবাক হয়ে বলল, জীবাণূ ঘটিত অসুখ?'

'হ্যাঁ জীবানূ ঘটিত। এইসব জীবাণুর উৎপত্তি হয় কোন এক সুন্দরী তরুণীর চোখে। জীবাণুর নাম হচ্ছে প্রেম–জীবাণু। ইংরেজীতে বলে Love bug, 'ঠাট্টা করছি না ভাই, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। জীবাণুর প্রথম আক্রমণে নার্ভাস সিষ্টেম উইক হয়ে যায়। তারপর লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

'কি যে বলেন।'

'সত্যি কথা বলছি রে ভাই। খুবই সত্যি কথা–এখন বল মেয়েটা কে?'

'কেউ না।'

'সোবাহান সাহেবের মেয়ে মিলি নাতো?'

মনসুরের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। কুদ্দুস সাহেব বললেন, আগেই সন্দেহ হয়েছিল এখন তোমাকে দেখে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম। তোমার অবস্থাতো দেখি কাহিল!

মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনি যা ভাবছেন তা না।

'আমি কিছুই ভাবছি না। ভাবাতাবির ফাঁক তুমি রাখনি। এখন আমার উপদেশ শোন, সহজ পাচ্য খাবার খাবে। বেশী করে ডাবের পানি খাবে। সকাল বিকাল লাইট একসারসাইজ। প্রেম জীবাণু ঘটিত অসুখের কোন চিকিৎসা নেই। জীবাণুগুলি ভাইরাস টাইপ, কোন ওষুধেই কাজ করে না। সময়ে রোগ সারে। টাইম ইজ দ্যা বেষ্ট হিলার। সতীনাথের বিরহের গানগুলি শুনতে পার। এতেও অনেক সময় আরাম হয়–ঐ যে আমি এধারে তুমি ওধারে, মাঝে নদী কুলকুল বয়ে যায় টাইপ গান।

'ঠাট্টা করবেন না কুদ্দুস ভাই। ঠাট্টা তামাশা ভাল লাগে না।'

'ঠিক বলেছ, এই সময় ঠাট্টাটা অসহ্য লাগে। কেউ ঠাট্টা করলে ইচ্ছা করে টান দিয়ে জিভ ছিঁড়ে ফেলি। রোগের কঠিন সংক্রমনের সময় এটা হয়। অল্পতেই নার্ভ ইরিটেটেড হয়।'

মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, আমাকে কি করতে বলেন?

'কিছুই করতে বলি না। মিলি অল্প বয়েসী মেয়ে হলে চিঠি লিখতে বলতাম–এরা সেই ষ্টেজ পার হয়ে এসেছে। চিঠি লিখলে সবাইকে সেই চিঠি পড়ে শুনাবে এবং হাসাহাসি করবে। তুমি যদি আগবাড়িয়ে কথা বলতে চাও, তোমাকে ভাববে ভ্যাবলা। এক মনে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া তো আমি আর কোন পথ দেখি না। যাকে বলে আধ্যাত্মিক চেষ্টা। মাঝে মাঝে এই চেষ্টায় কাজ হয়। দৈব সহায় হয়। হঠাৎ হয়ত দেখবে মেয়েটা রিকসা এ্যাকসিডেন্ট করেছে। ধরাধরি করে তাকে এইখানে আনা হল। তুমি ফার্ষ্ট এইড দিলে। দেখা গেল অবস্থা সুবিধার না। তুমিই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে। মেয়েটাকে ব্লাড দিতে হবে। ব্লাড গ্রুপ এ পজেটিভ। দেখা গেল তোমারও তাই। তুমি ব্লাড দিলে। মেয়েটি করুণ গলায় বললে, আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন। আপনাকে ধন্যবাদ। তুমি গাঢ় গলায় বললে, ধন্যবাদ পরে হবে আগে সুস্থ হয়ে উঠ।

মনসুর বলল, চুপ করুনতো কুদ্দুস সাহেব, আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছে না।

কুদ্দুস সাহেব বললেন, সেটা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। করব কি বল, কথা বলা হয়ে গেছে অভ্যাস। তোমার অবস্থা দেখে খারাপও লাগছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। তাতে যদি কিছু হয়।

কিছু হল না। প্রেমের ক্ষেত্রে দৈব কখনোই সহায় হয় না। গল্পে, সিনেমায় হয়। জীবনটা গল্প সিনেমা নয়। জীবনের নায়িকারা, নায়কদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলেও চিনতে পারে না। স্যাভলনের শিশি কিনতে একবারই ফার্মেসীতে আসে দ্বিতীয়বার আসে না। গল্পে উপন্যাসে নায়িকারা ঘন ঘন অসুখে পড়ে। ডাক্তার নায়ক তখন চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলে। বাস্তবের নায়িকাদের কখনো কোন অসুখ হয় না, আর হলেও অন্য ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেন।

অবশ্যি মনসুরের বেলায় দৈব সহায় হল। শরৎকালের এক সন্ধ্যায় তার ডাক পড়ল নিরিবিলিতে। সোবাহান সাহেবের প্রেসার মাপতে হবে। তাঁর প্রেসার হাই হয়েছে। মাথা ঘুরছে। ব্লাড প্রেসার নামক ব্যধিটির উপর কৃতজ্ঞতায় মনসুরের মন ভরে গেল। বারান্দায় মিলি দাঁড়িয়েছিল। এও এক অকল্পনীয় সৌভাগ্য। বারান্দায় সে নাও থাকতে পারত। মিলির সঙ্গে দেখা না হলেও কিছু করার ছিল না। মিলির জন্যেতো আর তাকে ডাকা হয়নি। মিলি বলল, স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

মনসুর হতভম্ব। বলে কি এই মেয়ে। এই কথাগুলি কি সত্যি সত্যি বলছে না মনসুর কল্পনা করছে? কল্পনা হাওয়াই সম্ভব। নিশ্চয়ই কল্পনা। হেলুসিনেশন।

'আপনাকে বলেছে বোধ হয় বাবার ব্লাড প্রেসার মাপার জন্যে আপনাকে খবর দেয়া হয়েছে।'

'জ্বি বলেছে।'

'আপনার সঙ্গে একটা গোপন ষড়যন্ত্র করবার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

'জ্বি বলুন। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'যদি দেখেন বাবার প্রেসার খুব হাই না তবু বলবেন হাই। বাবার রেষ্টের দরকার। ভয় না দেখালে তিনি রেষ্ট নেবেন না। আপনি মিথ্যা করে বলতে পারবেন না?'

'জ্বি না।'

মিলির দৃষ্টি তীব্র হল। মনসুর বলল, আমি মিথ্যা বলতে পারি না।

'মিথ্যা বলতে পারেন না?'

'জ্বি না।'

'ও আচ্ছা, আমার জানা ছিল না। আপনাকে দেখে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়েছিল, যারা প্রয়োজনে কিছু মিথ্যা টিথ্যাও বলতে পারে। আপনি যে অসাধারণ তা বুঝতে পারি নি।'

'আপনি কি রাগ করলেন?'

'কথায় কথায় রাগ করা আমার স্বভাব না। আসুন, দোতলায় যেতে হবে। বাবা দোতলায়।'

সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় ওঠার পর মনসুর নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, একটা ভুল হয়ে গেছে।

'কি ভুল?'

'প্রেসার মাপার যন্ত্র ফেলে এসেছি।'

'সেকি, প্রেসার মাপার জন্যেইতো আপনাকে ডাকা হয়েছে–সেই জিনিসই আপনি ফেলে এসেছেন? আপনি মানুষ হিসেবে শুধু যে অসাধারণ তাই না, মনে হচ্ছে খুব ভুলো মন।'

'আমি এক দৌড়ে নিয়ে আসব। যাব আর আসব।'

'আপনাকে যেতে হবে না। আমি কাদেরকে পাঠাচ্ছি, ও নিয়ে আসবে।'

'না না আমিই যাই। এক মিনিট।'

মনসুর অতি দ্রুত সিঁড়ি টপকাচ্ছে। সেই দ্রুত সিঁড়ি ভাঙ্গা দেখে মিলির মনে হল–একটা একসিডেন্ট হতে যাচ্ছে, হবেই হবে। না হয়েই যায় না। আর তখনি হুড়মুড় শব্দ হল। ডাক্তার সাহেব মাঝ সিঁড়ি থেকে বলের মত গড়িয়ে নীচে নামতে লাগলেন। শব্দ শুনে সোবাহান সাহেব এবং মিনু বেরিয়ে এলেন, ফরিদ বেরিয়ে এল, বাসার কাজের ছেলে কাদের ছুটে এল।

সোবাহান সাহেব বললেন, এ কে?

মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব। তোমার প্রেসার মাপতে এসেছেন।

'প্রেসার মাপতে এসে মাটিতে শুয়ে থাকার কারণ কি?'

'পা পিছলে পড়ে গেছেন বাবা।'

'পা পিছলে পড়েছে টেনে তুলবি না? হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

মিলিকে টেনে তুলতে হল না, মনসুর নিজেই উঠল। সার্টের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, একদম ব্যথা পাইনি। সত্যি বলছি।

তার চারপাশের লোকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। সোবাহান সাহেব কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মনসুর বলল, এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাব। সোবাহান সাহেব বললেন,

অবশ্যই খাবে। মিলি একে নিয়ে ফ্যানের নীচে বসা। কাদের এগিয়ে এসে বলল, আমারে ধইরা ধইরা হাঁটেন ডাক্তার সাব। চিন্তার কিছু নাই, উপরে আল্লা নীচে মাডি।

নীচে মাটি এমন কোন লক্ষণ মনসুর পাচ্ছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে সে চোরাবালির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পা ডেবে ডেবে যাচ্ছে। ঘরটাও মনে হচ্ছে একটু একটু দুলছে। কে যেন বলল, 'বাবা তুমি এখানে বস।'

কে বলল কথাটা? ঐ মহিলা না? ইনি বোধ হয় মিলির মা। তাকে কি সালাম দেয়া হয়েছে? স্লামালিকুম বলা দরকার না? দেরী হয়ে গেছে বোধ হয়। দেরী হলেও বলা দরকার।

'নিন পানি নিন।'

মনসুর পানি নিল। নিয়েই ক্ষীণ স্বরে বলল, স্লামালিকুম। বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। কথা এমন জিনিস একবার বলা হয়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মনসুর লক্ষ্য করল তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। সে নিশ্চয়ই খুব উল্টা পাল্টা কিছু বলেছে। টেনশনের সময় তার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মনসুর অবস্থা স্বাভাবিক করবার জন্যে শব্দ করে হাসল। অবস্থা স্বাভাবিক হল না মনে হল আরো খারাপ হয়ে গেল।

ফরিদ বলল, ছোকরার মনে হয় ব্রেইণ ডিফেক্ট হয়ে গেছে। কেমন করে হাসছে দেখুন না দুলাভাই। অবিকল পাগলের হাসি। সোবাহান সাহেব বললেন, একজন ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার।

ফরিদ বলল, ডাক্তার কিছু করতে পারবে বলেতো মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা ব্রেইণ হেমারেজ। হোয়াট এ পিটি, এ রকম ইয়াং এজ।

৩

আনিস অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে ভয়ংকর একটা রাগের ভঙ্গি করতে। যা দেখে তার আট বছরের ছেলে টগর আঁৎকে উঠবে এবং মুখ কাচুমাচু করে বলবে, আর করব না বাবা। টগর যা করেছে তাকে ক্ষমা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। সে ফায়ার ব্রিগেড খেলা খেলছিল। আগুন ছাড়া এরকম খেলা হয় না, কাজেই অনেক কষ্টে সে বিছানার চাদরে আগুণ ধরান। তাকে সাহায্য করছিল তার ছোট বোন নিশা যার বয়স পাঁচ হলেও এই জাতীয় কাজ খুব ভাল পারে। খেলার দু'টি অংশ, প্রথম অংশে বিছানার চাদর এবং জানালার পর্দায় আগুন লেগে যাবে, নিশা তার খেলনা টেলিফোন কানে নিয়ে বলবে, হ্যালো, আমাদের বাসায় আগুন লেগে গেছে। তখন শুরু হবে খেলার দ্বিতীয় অংশ–টগর সাজবে ফায়ার ম্যান। বাথরুম থেকে নল দিয়ে সে পানি এনে চারদিকে ছিটিয়ে আগুন নেভাবে। বেশ মজার খেলা।

খেলার প্রথম অংশ ভালমত শুরু হবার আগেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তিন তলার ভাড়াটে ছুটে এলেন। একতলা থেকে বাড়িওয়ালা এলেন এবং ঘন ঘন বলতে লাগলেন, কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !

আনিস গিয়েছিল বাড়ির খোঁজে। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে। গত মাসেই বাড়ি ছাড়ার কথা। এখনো কিছু পাওয়া যায়নি বলে বাড়ি ছাড়া যাচ্ছে না। বাড়িওয়ালার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এবার তিনি আর মুখের কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। পাড়ার ছেলেপুলে দিয়ে তুলে দেবেন। গত সপ্তাহে খুব ভদ্র ভাষায় এ জাতীয় ইংগীত দেয়াও হয়েছে।

সারাদিন বাড়ি খুঁজে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে বাসায় ফিরে টগর এবং নিশার নতুন কীর্তি শোনার পর মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। আনিসের মেজাজ যথেষ্টই খারাপ, কিন্তু তা সে ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না। টগরের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়া খুবই প্রয়োজন, হাত উঠছে না। বাচ্চা দুটির মা এক বছর আগে মারা গেছে। মা নেই দু'টি শিশুর উপর রাগ করা কিংবা তাদের শাসন করা বেশ কঠিন ব্যাপার। আনিসের বেলায় তা আরো কঠিন কারণ রাগ তার স্বভাবে নেই। সে এক দৃষ্টিতে টগরের দিকে তাকিয়ে আছে। টগর খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে তবে খুব ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে না।

'টগর!'

'জ্বি বাবা।'

টগর যা করে নিশার ঠিক সেই জিনিসটিই করা চাই, কাজেই সেও বলল, জ্বি বাবা।

আনিস বলল, নিশা মা, তুমি এখন কোন কথা বলবে না। টগরের সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে। ওকে আমি যা বলব তা খুব মন দিয়ে শুনবে।

'টগর!'

'জ্বি বাবা।'

'ঘরে আগুন লাগিয়েছিলে?'

'নাতো– বিছানার চাদরে লাগিয়েছিলাম। আর নিশাকে বলেছিলাম জানালার পর্দায় লাগাতে।'

'কি জন্যে?'

'আমরা ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস খেলছিলাম।'

'খেলতে আগুন লাগে?'

'অন্য খেলায় লাগে না। ফায়ার সার্ভিস খেলায় লাগে। আগুন না লাগলে নেভাব কি করে?'

'আমি খুব রাগ করেছি টগর। এত রাগ করেছি যে আমার গা কাঁপছে রাগে।'

'কই বাবা, গা তো কাঁপছে না।'

'তোমরা দু'জন খুবই অবাধ্য হয়েছ। আমার কোন কথা তোমরা শোন না। রোজ অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেলা খেল। দু'দিন আগে দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়লে।'

'দোতলার ছাদ থেকে তো লাফ দেই নি। গ্যারাজের উপর থেকে লাফ দিয়েছি। নীচে বালি ছিল। একটুও ব্যথা পাইনি। বালি না থাকলে লাফ দিতাম না।'

'তোমাদের কখনো আমি কোন শাস্তি দেই না বলে এই অবস্থা হয়েছে। আজ তোমাদের শাস্তি দেব।'

'কি শাস্তি?'

'তুমি নিজেই ঠিক কর কি শাস্তি। আমি কিছু বলব না।'

'এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকব বাবা?'

'বেশ দাঁড়াও।'

টগর এবং নিশা দু'জনই উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। দেখা গেল শাস্তি গ্রহণে দু'জনেরই সমান আগ্রহ। এই শাস্তিতে তারা বেশ মজা পাচ্ছে বলেও মনে হল। মিটিমিটি হাসছে–

'টগর!'

'জ্বি বাবা!'

'একটা কথা তোমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে–কথাটা হচ্ছে----

আনিস তার দীর্ঘ বাক্য শেষ করতে পারল না, বাড়িওয়ালার ভাগ্নে এসে বলল, আপনাকে মামা ডাকে। আনিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে বকবক করতে তার মোটেই ইচ্ছা করছে না। উপায় নেই, ইচ্ছা না করলেও বকবক করতে হবে।

আনিসের বাড়িওয়ালার নাম মীর্জা সুলায়মান। ভাড়াটেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল। শুধু ভাল না, বেশ ভাল। সুলায়মান সাহেবের ব্যবহার অতি মধুর। হাসি হাসি মুখ না করে তিনি কোন কথা বলেন না। ভাড়াটেদের যখন ডেকে পাঠান তখন বসার ঘরের টেবিলে নানান ধরনের খাবার দাবার তৈরী থাকে।

আনিস বাড়িওয়ালার বসার ঘরে ঢুকে দেখল টেবিলে ঠান্ডা পেপসির গ্লাস, প্লেটে ফ্রুট কেক। সুলায়মান সাহেবের বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও তিনি তার সব ভাড়াটেদের ডাকেন–বড় ভাই। কেউ এই নিয়ে কিছু বললে তিনি বলেন, এটা হচ্ছে আমার দস্তুর। আমার পিতাজীর কাছ থেকে শিখেছি। পিতাজী সবাইকেই বড় ভাই ডাকতেন।

সুলায়মান সাহেব তার দস্তুর মত আনিসকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, বড় ভাই সাহেব আছেন কেমন?

'জ্বি ভাল।'

'আপনার পুত্রতো সর্বনাশ করে দিয়েছিল। দোতলায় উঠে দেখি বুন্দা বুন্দা ধূয়া। কোথায় আমাকে দেখে ভয় পাবে তা না উল্টা ছেলে আমাকে বলে–আপনি এখন যান, আমরা খেলছি। আপনাকে দেখে মনেই হয় না যে আপনার এমন বিচ্ছু ছেলে মেয়ে আছে।

আনিস গম্ভীর গলায় বলল, আপনি আপনার বাবার মত হয়েছেন, সবাই সে রকম হয় না।

'খুবই খাঁটি কথা। তাছাড়া বড় ভাই সাহেব একটা ব্যাপার কি জানেন? অল্প বয়সে মা মারা গেলে ঘাড়ের একটা রগ তেড়া হয়ে যায়। ওদের তাই হয়েছে। রগ হয়ে গেছে তেড়া।'

'হতে পারে।'

'এদের সামলাবার জন্যে আপনার একটা বিবাহ করা দরকার। ঘরের শাসন হচ্ছে আসল শাসন। নেন কেক মুখে দেন। ফ্রেঞ্চ বেকারীর কেক। একশ টাকা পাউন্ড।'

আনিস কেক মুখে দিল। সুলায়মান সাহেব মধুর গলায় বললেন, অনেক পুরুষ আছে যারা মনে করে সংসারে সৎ মা এলে ছেলেপুলেদের উপর অত্যাচার হবে। কথা ঠিক। অত্যাচার হয়। তবে বুঝে সুঝে বউ আনলে হয় না।

'আমি বুঝে সুঝেই আনব।'

'বুদ্ধি কম এমন মেয়ে বিবাহ করতে হবে। বুদ্ধি কম মেয়ে মুখের একটা মিষ্টি কথাতেই খুশি হয়। এদের খুশি করা খুব সোজা। নিউ মার্কেট থেকে আসার পথে এক টাকা দিয়ে একটা ফুলের মালা কিনে নিয়ে গেলেন–এতেই খুশি আর বৌ যদি বুদ্ধিমতী হয় তাহলে কিছুতেই খুশি হবে না। জ্বালিয়ে মারবে। বোকা স্ত্রীর সংসার হচ্ছে সুখের সংসার।'

আনিস বলল, বোকা মেয়ে পাওয়াইতো মুশকিল। সব মেয়েরেই বুদ্ধি বেশি।

'বড় ভাই সাহেব, ভুল কথা বললেন, পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি অনেক কম।'

'তাই–না–কি?'

'হ্যাঁ। আমার মুখের কথা না, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। একজন পুরুষ মানুষের ব্রেইনের ওজন হচ্ছে ১,৩৭৫ গ্রাম। আর একজন মেয়ে মানুষের ১,২২৫ গ্রাম। একশ পঞ্চাশ গ্রাম কম।'

'এই তথ্য পেয়েছেন কোথায়?'

'খোজ খবর রাখি বড় ভাই। একেবারে মূর্খতো না। কই, এখানে চা দিল না।'

'পেপসি খেলামতো আবার চা কেন?'

'পেপসি খেলেন পানির বদলে। চা ছাড়া নাস্তা শেষ হয় না–কি? হয় না।'

আনিস নাস্তার শেষে চা এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সুলায়মান সাহেব বললেন, বড় ভাই সাহেব, এবার একটু কাজের কথা বলি।

'বলুন।'

'ফ্ল্যাটটা যে বড়ভাই ছেড়ে দিতে হয়।'

'ছেড়েই দেব। বাড়ি খুঁজছি। বিশ্বাস করুন খুঁজছি। পাওয়া মাত্র ছেড়ে দেব।'

'বুধবারের মধ্যেই যে ছেড়ে দিতে হয় ভাই সাহেব। আমি একজনকে জবান দিয়ে ফেলেছি, সে বুধবারে বাড়িতে উঠবে। জবান তো বড় ভাই সাহেব রক্ষা করতে হয়।'

'আমি যদি এর মধ্যে কিছু খুঁজে না পাই–আমি যাব কোথায়?

'আমি আমার একটা ঘর ছেড়ে দিব। মেহমান হিসেবে কয়েকদিন থাকবেন।'

চা এসে গিয়েছে। আনিস চা–য়ে চুমুক দিল। কি বলবে ভেবে পেল না।

'বড় ভাই সাহেব।'

'জ্বি বলুন।'

'বলতে শরম লাগছে–না বলেও পারছি না। আপনার কাছে তিন মাসের ভাড়া পাওনা আছে। বলেছিলেন একটা ব্যবস্থা করবেন।'

'অবশ্যই করব।'

'তা করবেন জানি। কিন্তু ভাইসাহেব যাওয়ার আগে করে যাওয়াটা কি ভাল না? একবার চলে গেলে আপনার হয়ত মনে থাকবে না?'

আনিস তিক্ত গলায় বলল, এই মুহূর্তে আমার হাত একেবারে খালি তবে স্ত্রীর কিছু গয়না আছে। ঐগুলি বিক্রী করে হলেও আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব।

'এইটা খুব ভাল কথা বলেছেন। যে পুরুষ ঋণ রেখে এক কদম পা ফেলে না, সে হচ্ছে সাচ্চা পুরুষ। বড় ভাই সাহেব, আমার একটা পরিচিত গয়নার দোকান আছে। আপনি যদি চান আপনাকে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে যাব আপনার সঙ্গে।'

'কাল বিকালে কি আপনার সময় হবে?'

'হবে। এখন তাহলে উঠি? না–কি আরো কিছু খাওয়াবেন?'

সুলায়মান সাহেব হো হো করে অনেকক্ষণ হাসলেন। যেন এরকম মজাদার কথা অনেকদিন শোনেননি। আনিস শীতল গলায় বলল, এরকম শব্দ করে হাসবেন না সুলায়মান সাহেব। শব্দ করে হাসলে হার্টে প্রেসার পড়ে। আপনার যা বয়স তাতে হার্টে বাড়তি প্রেসার দেয়াটা ঠিক হবে না।

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ সত্যি। হাসাহাসি একেবারেই করবেন না। সব সময় মন খারাপ করে বসে থাকবেন তাহলেই দেখবেন হার্ট ভাল থাকবে, অনেক দিন বাঁচতে পারবেন।'

'অনেকদিন বাঁচতে ইচ্ছা করে না। যত তাড়াতাড়ি কবরে যেতে পারব ততই ভাল।'

'তাড়াতাড়ি কবরে চলে গেলে এই যে টাকা পয়সা রোজগার করছেন সেগুলি ভোগ করবে কে? ভোগ করবার জন্যেই তো আপনার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা দরকার।'

'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।'

'হ্যাঁ করছি।'

'হাসলে হার্টের উপর চাপ পড়ে ঐটাও তাহলে ঠাট্টা?'

'না ঐটা ঠাট্টা না। ঐটা সত্যি। যে কারণে হাসি খুশী মানুষদের বেশী দিন বাঁচতে দেখা যায় না। বেঁচে থাকে খিট খিটে গম্ভীর মানুষজন। দেখেন না পৃথিবী ভর্তি বদমেজাজী বুড়ো–বুড়ি।'

'কথাটাতো ভাইসাহেব খুব ভুল বলেন নাই।'

'কথা আমি সচরাচর ভুল বলি না। আচ্ছা আজ তাহলে যাই । কাল সন্ধ্যায় দেখা হবে। এক সঙ্গে গয়নার দোকানে যাব।'

'ইনসাআল্লাহ।'

হাসির ব্যাপারটা মনে রাখবেন। হাসি সম্পূর্ণ বন্ধ। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হলে রাম গরুর ছানা হতে হবে।'

নিজের ঘরে ঢুকে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। টগর এখনো একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছবি আঁকছে। বাবাকে দেখে নিশা বলল, টগর ভাইয়ার শাস্তি আর কতক্ষণ হবে বাবা?

আনিস বলল, শাস্তি শেষ।

টগর বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। আনিস বলল, পা ব্যথা করছে?

'হুঁ করছে।'

'আর কোনদিন ফায়ার ব্রিগেড খেলা খেলবে না তো?'

টগর না সূচক মাথা নাড়ল। আনিস বলল, মাথা নাড়লে হবে না। বল, আর কোনদিন খেলব না।

'আর কোনদিন খেলব না।'

'ভেরি গুড। তোমরা এখন হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস। আমি রান্না শেষ করি।'

'নিশা বলল, আমি কি তোমাকে সাহায্য করব বাবা?'

'না। সাহায্য লাগবে না। আজ তোমাদের কি খেতে ইচ্ছা করছে বল? ডিমের ভাজী না তরকারী?'

টগর বলল, আমরা রোজ ডিম খাচ্ছি কেন বাবা?

'ডিম রান্না সবচে সহজ এই জন্যে রোজ ডিম খাচ্ছি।'

নিশা গম্ভীর গলায় বলল, আমরা পৃথিবীর সব ডিম খেয়ে শেষ করে ফেলছি তাই না বাবা?

'হ্যাঁ তাই। এখন বই নিয়ে বস।'

'বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না।'

'কি ইচ্ছা করছে?'

নিশা অবিকল বড়দের মত গলায় বলল, কি যে ইচ্ছা করছে তাও তো জানি না।

আনিস হেসে ফেলল। তার ছোট মেয়েটি বড় মায়াবতী হয়েছে। কথা বলার কি অদ্ভুত ধরণ। কোথেকে পেয়েছে এসব?

টগর বলল, আজ রাতে কি গল্প বলার আসর বসবে বাবা?

'এখনো বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা আছে।'

গল্প বলার আসর শেষ পর্যন্ত বসল না। নিশা ঘুমিয়ে পড়েছে। একা একা গল্প শুনতে টগরের ভালো লাগে না। অথচ তার ঘুমও আসছে না। আনিস তার পিঠে চুলকে দিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তাতেও কিছু হলো না। টগর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। একটু পর পর বলছে—ঘুম আসছে না বাবা।

'একেবারেই আসছে না?'

'না।'

'তাহলে আস নতুন ধরনের একটা খেলা দু'জনে মিলে খেলি।'

'কি খেলা?'

'এই খেলাটার নাম হচ্ছে সত্যি–মিথ্যা খেলা। আমি তোমাকে প্রশ্ন করব তুমি মিথ্যা জবাব দেবে। দশটা প্রশ্ন করব। প্রতি বারই যদি মিথ্যা জবাব দিতে পার তাহলে তুমি জিতে যাবে। যেমন ধর আমি যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার নাম কি? তুমি যদি বল 'টগর' তাহলে তুমি হেরে যাবে। সব জবাব হতে হবে মিথ্যা।'

'এটাতো খুব সহজ খেলা বাবা।'

'মোটেই সহজ না। খুব কঠিন খেলা। কারণ মানুষ বেশিক্ষণ মিথ্যা কথা বলতে পারে না। পর পর দশটা মিথ্যা বলা মানুষের জন্যে খুব কঠিন। বেশির ভাগ মানুষই পারে না।

'আমি পারব?'

'না তুমিও পারবে না। এসো শুরু করা যাক। রেডি–ওয়ান টু থ্রী– আচ্ছা খোকা তোমার নাম কি –'টগর'?

'জ্বি না। আমার নাম টগর না।'

'তোমার ছোট একটা বোন আছে না?'

'জ্বি না। আমার একটা ভাই আছে।'

'তুমি কি ক্লাস থ্রিতে পড়?'

'জ্বি না আমি ক্লাস টেনে পড়ি।'

'তোমার কি তিনটা হাত আছে?'

'হ্যাঁ আমার তিনটা হাত আছে?'

'তুমি কি তোমার মা–কে খুব ভালবাস?'

'হ্যাঁ বাসি।'

আনিস হেসে ফেলল। টগর মাথা নীচু করে ফেলেছে। আনিস বলল, দেখলে তো টগর, মাত্র পাঁচটা প্রশ্নেই তুমি সত্যি কথা বলে ফেললে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা খুবই কঠিন।

টগর চাপা গলায় বলল, মিথ্যা কথা বলা কঠিন কেন বাবা?

'কঠিন, কারণ মানুষকে মিথ্যা কথা বলার জন্য তৈরী করা হয়নি। তবু আমরা মিথ্যা কথা বলি। যখন বলি তখন আমাদের খুব কষ্ট হয়।'

'আমার তো কষ্ট হয় না বাবা।'

'তুমি কি মিথ্যা কথা বল?'

'হ্যাঁ বলি। স্কুলে বলি।'

আনিস উপদেশ মূলক কিছু বলবে কি বলবে না এই নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। শৈশবে নীতিকথার আসলে কি কোন গুরুত্ব আছে? একই পরিবারের চারটি ছেলেমেয়ে শৈশবে একই ধরনের নীতিকথা এবং উপদেশ শোনে কিন্তু বড় হয়ে চারজন চার রকমের হয়। আনিসের ধারণা শিশুরা বইয়ের উপদেশ গ্রহণ করে না। একটি শিশু অন্য একটি শিশুর কথা শুনে কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষের কথা শুনে না। তাদের জগৎ ভিন্ন, তারা নিজেদের জগৎ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

'টগর।'

টগর জবাব দিল না। আনিস দেখল, টগর ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নিজের চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছে কিন্তু সে জানে বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুম চলে যাবে। নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় ভর করবে। তারপর আসবে সুখময় কিছু কল্পনা। সেই কল্পনায় চব্বিশ বছর বয়েসী একজন তরুণী এসে ঘরে ঢুকবে। পান খাওয়ায় সেই তরুণীর ঠোঁট লাল হয়ে আছে। তরুণীটির নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। টলমলে চোখে স্নিগ্ধ ছায়া।

আনিস বিরক্ত হবার মত ভঙ্গি করে বলবে, আবার পান খেয়েছ?
তরুণীটি বলবে, হ্যাঁ খেয়েছি।
'দাঁতগুলি নষ্ট করবে।'
'করলে করব। সারা দিনে একবার পান খাই তাতেই—'
'আচ্ছা যাও আর কিছু বলব না।'
'তোমার কি চা লাগবে?'
'হ্যাঁ
'ঘুমুতে যাবার আগে কেউ চা খায় এই প্রথম দেখলাম।'
'ঘুমুতে যাব তোমাকে কে বলল?'
'ঘুমুবে না?'
'নো ম্যাডাম। সারা রাত জাগব।'
'লেখালেখি?'
'হ্যাঁ লেখালেখি। নতুন উপন্যাস শুরু করছি।'
'তুমি না বললে সোমবার থেকে শুরু করবে।'
'দু'দিন আগেই শুরু করছি।'
'উপন্যাসের নাম কি?'
'ময়ূরাক্ষী। নামটা কেমন?'
'সত্যি জানতে চাও।'
'হ্যাঁ।'
'বললে রাগ করবে নাতো?'
'না–এর মধ্যে রাগ করার কি আছে?'
'নিউ এলিফেন্ট রোডের একটা জুতার দোকানের নাম ময়ূরাক্ষী।'

আনিস তাকিয়ে আছে। তরুণী খিল খিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। তবু সে হাসছে। কি অসাধারণ একটি দৃশ্য। এমন চমৎকার দৃশ্য তার জীবনে অভিনীত হয়েছে এই কথাটা আজ আর কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। আজ মনে হয় 'রাত্রি' নামে কোন তরুণীর সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। সবই কল্পনা সবই মায়া।

৪

সোবাহান সাহেবের সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সোবাহান সাহেব তাকে চিনতে পারলেন না। মাঝারি গড়নের একজন যুবক। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, চোখে মোটা কাচের চশমা। মুখ ভর্তি দাড়ি গোফ। এই দাড়ি–শখের দাড়ি। যুবকটির চোখে মুখে কোন রকম জড়তা নেই। মুখ হাসি হাসি। গেট খুলে তরতর করে এগিয়ে এসেছে। যেন বাড়ি ঘর খুব পরিচিত। অনেকবার এসেছে।

'স্লামালিকুম।'
'ওয়ালাইকুম সালাম।'
'আমার নাম আনিস। আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?'
'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি না। অচেনা লোকের সঙ্গে কি আপনি কথা বলেন না?'

সোবাহান সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। এই যুবকের মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেশ ভর্তি হয়ে গেছে মতলববাজ যুবকে। এদের কোন রকম প্রশ্রয় দেয়া উচিত না।

'স্যার, আমি কি বসব?'

'দীর্ঘ আলাপ থাকলে বসুন। আর সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বলার থাকলে বলে চলে যান।'

আনিস বসল। তার কাঁধে একটা ভারী হ্যান্ড ব্যাগ ঝুলছিল, সেই হ্যান্ডব্যাগ খুলে কোলের উপর রাখল। সোবাহান সাহেব অত্যন্ত সন্দেহজনক দৃষ্টিতে হ্যান্ডব্যাগের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মন বলছে ছোকরার আসার উদ্দেশ্য এই হ্যান্ডব্যাগেই আছে। কিছু একটা গছাতে এসেছে। সম্ভবত ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর লোক। পটিয়ে পটিয়ে ইনস্যুরেন্স করিয়ে ফেলবে।

সোবাহান সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, বলুন কি ব্যাপার। সংক্ষেপে বলবেন। লম্বা কথা শোনার সময় বা ধৈর্য কোনটাই আমার নেই।

'আপনার বাড়ির দোতলার ছাদে দু'টা ঘর আছে। ঐ ঘর দুটা কি আপনি ভাড়া দেবেন?'

'ছাদের ঘর ভাড়া দেয়া হবে এই রকম কোন বিজ্ঞাপন কি আপনার চোখে পড়েছে?'

'জ্বি না।'

'তা-হলে?'

'আমি এই এলাকায় বাড়ি খুঁজছিলাম। তখন একজন বলল, এক সময় তেতলার দু'টি ঘর আপনি ভাড়া দিতেন।'

'এক সময় দিতাম বলে সারা জীবন দিতে হবে?'

'তা-না। আপনি রাগছেন কেন? জোর করে নিশ্চয়ই আমি আপনার বাড়িতে উঠব না।'

'আপনি কি করেন?'

'কিছু করি না।'

'কিছু করি না মানে? কিছু না করলে সংসার চলে কি ভাবে?'

'আমি একজন লেখক। লেখালেখি করি।'

'কি নাম?'

'আগে একবার বলেছিলাম।'

'দ্বিতীয়বার বলতে অসুবিধা আছে?'

'না নেই-আমার নাম আনিস।'

'এই নামে কোন লেখক আছে বলেতো জানি না।'

'আমি ছদ্মনামে লিখি।'

'ছদ্মনামটা কি?'

'আপনাকে বলতে চাচ্ছি না। ছদ্মনাম গ্রহণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজেকে আড়াল করা। যদি বলেই ফেলি তাহলে শুধু শুধু আর ছদ্মনাম নিলাম কেন?'

'তুমি কি লেখ?'

আনিস লক্ষ্য করল এই ভদ্রলোক হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন এবং নিজে তা বুঝতে পারছেন না।

এইটি ভাল লক্ষণ। আনিস বলল, গল্প, উপন্যাস এইসব লিখি। একটি প্রবন্ধের বই আছে। কেউ সেই বই পড়ে না।

'আমার বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ইচ্ছা তোমার কেন হল?'

'শুনেছি আপনি ভাড়া খুব কম নিতেন। এ্যাডভান্সের ঝামেলা ছিল না। তাছাড়া বাড়িটাও আমার পছন্দ হয়েছে।'

'তুমি কি ব্যাচেলার?'

'জ্বি না। আমার দু'টি বাচ্চা আছে।'

'দেশের সমস্যা নিয়ে কি তুমি ভাব?'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'এই যে দেশে অসংখ্য সমস্যা এই সব নিয়ে কখনো ভাব?'

'কোন সমস্যার কথা বলছেন?'

'সব রকম সমস্যা।'

'জ্বি–না, ভাবি না।'

'তুমি একজন লেখক মানুষ, তুমি এই সব নিয়ে ভাব না? তুমি কি রকম লেখক?'

'খুবই বাজে ধরণের লেখক।'

'তুমি এখন যেতে পার। তোমাকে বাড়ি ভাড়া দেব না।'

'দেবেন না?'

'না। তোমাকে আমার পছন্দ হয় নি।'

'আপনাকেও আমার পছন্দ হয় নি। তবে আপনার বাড়ি পছন্দ হয়েছিল।'

'আমাকে পছন্দ না হবার কারণ?'

'আপনি হচ্ছেন এক শ্রেণীর পয়সাওয়ালা অকর্মন্য বৃদ্ধ। যারা দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবে এবং মনে করে এই ভাবনার কারণে সে অনেক বড় কাজ করে ফেলছে। এক ধরণের আত্মতৃপ্তি পায়। আসলে আপনার এইসব চিন্তা ভাবনা অর্থহীন এবং মূল্যহীন। আপনার যা করা উচিত তা হচ্ছে–রগরগে থ্রীলার পড়া। মাঝে মাঝে দান দক্ষিণা করা যাতে পরকালে সুখে থাকতে পারেন। ইহকাল এবং পরকাল দু'টিই ম্যানেজ করা থাকে বলে।'

'অভদ্র ছোকরা। ষ্টপ। ষ্টপ।'

'আপনি খুব বেশি রেগে যাচ্ছেন। আপনার প্রেসার টেসার নেইতো? প্রেসার থাকলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে।'

'বহিস্কার। বহিস্কার। এই মুহূর্তে বহিস্কার।'

সোবাহান সাহেব প্রচন্ড চিৎকার করতে লাগলেন। মিনি বারান্দায় ছুটে এল। চোখ বড় বড় করে বলল, কি হয়েছে?'

'এই ছোকরাকে ঘাড় ধরে বের করে দে। ফাজিলের ফাজিল, বদের বদ।'

মিলি কড়া গলায় বলল, আপনি বাবাকে কি বলেছেন?

আনিস অবস্থা দেখে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও সে বলতে পারল না। মিলি বলল, প্লীজ আপনি এখন কথা বলে আর ঝামেলা বাড়াবেন না। চলে যান।

আনিস গেট পার হয়ে চলে যাবার পর সোবাহান সাহেব বললেন, কাদের বাসায় আছে?

মিলি বলল, আছে।

'কাদেরকে বল ঐ ছোকরাকে ধরে আনতে।'

'বাদ দাও না বাবা। আর কেন?'

'যা করতে বলছি কর।'

'ভদ্রলোক কে?'

'আমাদের নতুন ভাড়াটে।'

'তোমার কথা বুঝলাম না বাবা।'

'তিনতলার ঘর দু'টা তার কাছে ভাড়া দিয়েছি। ছোকরাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ছোকরার মাথা পরিষ্কার।'

কাদের আনিসকে আনতে গেল। সোবাহান সাহেব নিজেই দোতলার ছাদে উঠলেন ঘর দুটির অবস্থা দেখার জন্যে। অনেক দিন তালাবন্ধ হয়ে আছে। পরিষ্কার টরিস্কার করানো দরকার।

দু'টি ঘর। একটা বাথরুম, রান্নাঘর। ছোট পরিবারের জন্যে খুব ভালই বলতে হবে। ঘর দু'টির সামনে বিশাল ছাদ। ছাদে অসংখ্য টব, টবে ফুলের চাষ হচ্ছে। মিলির শখ।

মিনু ছাদে উঠে এলেন। তার মুখ থমথমে। কিছুক্ষণ আগে মিলির কাছে তিনি বাড়ি ভাড়া দেবার খবর শুনেছেন। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে।

'তুমি নাকি ছাদের ঘর দু'টি ভাড়া দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে দিলে?'

'নামটা মনে আসছে না। ফাজিল ধরনের এক ছোকরা।'

'বাড়ি ভাড়া দেয়া কি খুব দরকার ছিল?'

'না।'

'তাহলে, বাড়ি ভাড়া দিলে কেন?'

'আমার দরকার ছিল না, কিন্তু ঐ ফাজিলের দরকার ছিল।'

'তুমি হুট করে একেকটা কাজ কর আর সমস্যা হয়।'

সোবাহান সাহেবের মেজাজ চট করে খারাপ হয়ে গেল। তিনি থমথমে গলায় বললেন, আমি সমস্যার সৃষ্টি করি?

মিনু চুপ করে গেলেন। সোবাহান সাহেব চাপা গলায় বললেন, আমার জন্য কারোর কোন সমস্যা হোক তা আমি চাই না।

এই বলেই তিনি নীচে নেমে গেলেন। মিনু গেলেন পেছনে পেছনে।

একতলার বারান্দায় আনিস দাঁড়িয়ে আছে। কাদের তাকে নিয়ে এসেছে। আনিস খানিকটা শংকিত বোধ করছে। বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আবার ডেকে আনার অর্থ সে ঠিক ধরতে পারছে না। সোবাহান সাহেব তার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং শুকনো গলায় বললেন, এসেছ?

আনিস বলল, জ্বি। আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সোবাহান সাহেব বললেন, তোমাকে বাড়ি ভাড়া দেয়া হবে না এটা বলার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

'সেতো একবার বলেছেন।'

'আবার বললাম, আবার বলায় তো দোষের কিছু নেই।'

'জ্বি না নেই। দ্বিতীয়বার বলাটা ভাল হয়েছে। এখন কি আমি যেতে পারি?'

'হ্যাঁ যাও।'

'স্লামালিকুম।'

আনিস গেটের বাইরে বেরুতেই মিনু বললেন, কাদের যা ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে আয়।

কাদের সোবাহান সাহেবের দিকে তাকাল। তিনি কিছু বললেন না। মিনু বলল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা। কাদের বিমর্ষ মুখে বের হল। বড় যন্ত্রণায় পড়া গেল।

আনিস বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কাদের সেখানেই তাকে ধরল, নিস্প্রাণ গলায় বলল, আপনেরে বুলায়।

আনিস বলল, ঠাট্টা করছ?

'জ্বি না। আবার যাইতে বলছে।'

'আবার যাব?'

'যাইতে ইচ্ছা না হইলে যাইয়েন না। আমারে খবর দিতে কইছে খবর দিলাম। যাওন না যাওন আফনের ইচ্ছা।'

'নাম কি তোমার?'

'আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের।'

'সৈয়দ নাকি।'

'জ্বি। বোগদাদী সৈয়দ।'

'বল কি? বোগদাদী সৈয়দ যখন খবর নিয়ে এসেছে তখন তো যেতেই হয়।'

আনিস তৃতীয়বারের মত নিরিবিলি বাড়ির বারান্দায় এসে উঠল। সোবাহান সাহেব তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, কাদের ভদ্রলোককে তিনতলার ঘর দুটার চাবি এনে দে।

আনিস বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ।

রাত আটটার মত বাজে।

মিলি বিরক্ত মুখে খাতা কলম নিয়ে বসে আছে। তার সামনে চার পাঁচটা বই। আগামীকাল সকাল নটায় তার টিউটোরিয়েল ক্লাস। এ্যাসাইনমেন্টের কিছুই এখনো করা হয়নি। বিষয়টাই মাথায় ঢুকছে না। এর আগের টিউটোরিয়েলে বি মাইনাস পেয়েছে। এবার মনে হচ্ছে সি মাইনাস হবে। খাতায় প্রথম বাক্যটা লিখে শেষ করবার আগেই কাদের ঘরে ঢুকে বলল, আফা আফনেরে ডাকে।

মিলি রাগি গলায় বলল, কে ডাকে?

'ডাক্তার সাব। গ্রীণ ফার্মেসীর চেংড়া ডাক্তার?'

'আমাকে ডাকছে কি জন্যে? আমার কাছে কি?'

'আমি ক্যামনে কই আফা? আমি হইলাম গিয়া চাকর মানুষ। আমার সাথে কি আর খাতিরের আলাপ করব?'

মিলি কঠিন গলায় বলল, তুই কথা বেশি বলিস, কথা কম বলবি।

'অর্ডার দিলে কথাই কমু না। অসুবিধা কি? কথা কওনের মইদ্যেতো আফা আরাম কিছু নাই।'

'যা আমার সামনে থেকে।'

কাদের গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। পেছনে পেছনে আসছে মিলি, বে-আক্কেল ডাক্তারের জন্যে তার মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে, যদিও তাকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

মনসুরের পোষাক আষাক আজ খুবই পরিপাটি। সার্ট প্যান্ট সবই নতুন কেনা হয়েছে। জুতা জোড়াও নতুন। জুতা জোড়া সাইজে খানিকটা ছোট হয়েছে। কেনার সময় তা ঠিক বোঝা যায়নি। এখন জানান দিচ্ছে। পা টন টন করছে। পায়ের আঙ্গুলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে কি-না কে জানে। মিলিকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। মিলি বলল, কি ব্যাপার ডাক্তার সাহেব?

'না মানে আপনার বাবার প্রেসারটা চেক করতে এসেছিলাম।'

'আপনাকে কি আসতে বলেছিল কেউ?'

'জ্বি না। তবে উনার যেহেতু হাই প্রেসারের টেনডেন্সি কাজেই প্রায়ই চেক করা দরকার।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি আপনাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখেই যাই।'

'ভাল করেছেন। বাবা দোতলায় তাঁর ঘরে। আসুন বাবার কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'চলুন।'

মিলি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, আপনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন?

মনসুর লজ্জিত গলায় বলল, নতুন জুতা। সাইজে হয়েছে ছোট। কেনার সময় বুঝতে পারি নি। মনসুর সিঁড়ির শেষ মাথা পর্যন্ত উঠল না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দিশাহারা গলায় বলল, একটা ভুল করে ফেলেছি।

মিলি বলল, প্রেসার মাপার যন্ত্র ফেলে এসেছেন। তাই না?

'জ্বি।'

'তাহলে আজ বরংচ চলে যান। বাবার শরীর যদি খারাপ হয় আপনাকে খবর দেব।'

'আমি বরং এক দৌড়ে নিয়ে আসি। যাব আর আসব।'

'তেমন ইমার্জেন্সিতো না। ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। আপনি সিঁড়ি ধরে ধরে নামুন। ঐ দিনের মত হওয়াটা ভাল হবে না।'

মনসুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটা ঐ দিনকার ঘটনাটা ভুলতেই পারছে না। সামান্য দুর্ঘটনার বেশিতো কিছু না। দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে না? সব সময়ই তো ঘটছে।

অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যেই কি না কে জানে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে মনসুরের নতুন জুতা স্লিপ কাটল। অতি সহজেই মনসুর নিজেকে সামলাতে পারত কিন্তু সে কেন জানি মিলির মুখের দিকে তাকাতে গেল আর তখনি রেলিং-এ ধরে রাখা হাত ফসকে গেল। সে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। আজ ঐ দিনের চেয়েও ভয়াবহ শব্দ হল।

সোবাহান সাহেব, ফরিদ, কাদের এবং রহিমার মা ছুটে এল। সোবাহান সাহেব বললেন, কি ব্যাপার? মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব পড়ে গেছেন।

ফরিদ বিস্মিত গলায় বলল, কোন ডাক্তার ঐ দিনকার পাগলা ডাক্তার?

মিলিকে ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। মনসুর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একেবারেই ব্যথা পাইনি।

ফরিদ বলল, আপনি ব্যথা পেয়েছেন কি পাননি এটা আমার জিজ্ঞাস্য নয়। আমি জানতে চাচ্ছি আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে 'আছাড় খাওয়া' রোগ নামে কোন রোগ আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে সেই রোগের চিকিৎসা আছে না সেটা দুরারোগ্য ব্যধি?

মনসুরের মনে হল ইনি রসিকতা করছেন। অপমান জনক পরিস্থিতিতে রসিকতা খুবই ভাল জিনিস। সবাই মিলে এক সঙ্গে হেসে উঠলে ব্যাপারটা হালকা হয়ে যায়। সবাই হেসে উঠবে এই ভেবে মনসুর উচ্চস্বরে হাসল। আশ্চর্য অন্য কেউ তার সঙ্গে হাসছে না। বরংচ কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। নির্ঘাৎ তাঁকে পাগল ভাবছে।

ফরিদ বলল, কাদের ইনাকে ধরাধরি করে বাসায় রেখে আয়। আমার ধারণা ভদ্রলোকের ব্রেইণ ফাংশান করছে না। এই যে ভাই ডাক্তার সাহেব, আপনি কাদেরের সঙ্গে যান। সপ্তাহখানেক বেড রেস্টে থাকবেন। বিশ্রামের মত ভাল জিনিস আর কিছু নেই। সব চিকিৎসার সেরা চিকিৎসা হচ্ছে বিশ্রাম।

নিরিবিলি বাড়ির দু'জন সদস্য রাতের খাবার খেতে বসেছে। ফরিদ এবং মিলি। মিনু বেশীর ভাগ সময় রাতে খান না। আজও খাবেন না। বাকি শুধু সোবাহান সাহেব। ফরিদ এবং মিলি প্লেটে ভাত নিতে নিতে সোবাহান সাহেব এসে পড়লেন। ফরিদ হাসি মুখে বলল, কেমন আছেন দুলাভাই?

সোবাহান সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন।

'কথা বলছেন না কেন দুলাভাই? রাগ করলেন না কি?'

'চুপচাপ খাওয়া দাওয়া কর। আমাকে বিরক্ত করবে না।'

'খাওয়ার টেবিল হচ্ছে সামাজিকভাবে মেলামেশার একটা স্থান। নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া করে উঠে যাওয়া খাবার টেবিলের উদ্দেশ্য নয়।'

'চুপ কর।'

'এত ভাল যন্ত্রণা হল দেখি–কিছু বললেই চুপ কর। আপনার সমস্যাটা কি?'

মিনু লেবু দিতে এসে বললেন, চুপচাপ খেয়ে বিদেয় হ ফরিদ। ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। গল্প গুজব করে খাওয়া দাওয়া করতে তার ভাল লাগে। দুলাভাই টেবিলে থাকলে তা সম্ভব হয় না। সোবাহান সাহেব মিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজও ইলিশ? পর পর তিন দিন ইলিশ হয়ে গেল না?

'কি করব, বাজারে মাছ নেই। কাদেরকে পাঠালে ইলিশ নিয়ে চলে আসে। মাছের খুব আকাল।'

সোবাহান সাহেব মিলির দিকে তাকিয়ে আফসোসের স্বরে বললেন, এই দেশ মাছে এক সময় ভর্তি ছিল। মেঘের ডাক শুনে ঝাঁক বেঁধে কৈ মাছ পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে পড়ত। মাছের জন্যে আমরা কি করতাম জানিস? নৌকা ডুবিয়ে রাখতাম। কয়েকদিন পর পর সেই নৌকা তুলে পানি সেছা হত। আর তখন—

'দুলাভাই, কিছু মনে করবেন না আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি। না করে পারছি না। আমাকে চুপ করে থাকতে বলে নিজে সমানে কথা বলে যাচ্ছেন এটা কেমন হল? প্রাচীন একটা আপ্ত বাক্য হচ্ছে– আপনি আচারি ধর্ম পড়কে শেখাও। আপনি তা করছেন না।'

সোবাহান সাহেব সরু চোখে ফরিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফরিদ সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল। মিলি মিনতি মাখা চোখে মামার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ বলছে–মামা, তোমার পায়ে পড়ছি বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিও না। মিলির চোখের ভাষা ফরিদকে কাবু করতে পারল না। সে উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল,

'আমাদের প্রফেটের সেই বিখ্যাত গল্পটা কি আপনার মনে আছে দুলাভাই? এক লোক তাঁর কাছে গিয়ে কাতর গলায় বলল, হুজুর বড় সমস্যায় পড়েছি, আমার মধ্যম পুত্র শুধু মিষ্টি খেতে চায়–'

'এই গল্পটি আমার জানা আছে ফরিদ।'

'আমারও ধারণা আপনার জানা আছে কিন্তু গল্পের মোরাল আপনি হয় ধরতে পারেননি কিংবা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চাননি।'

মিলি বলল, এই প্রসঙ্গটা থাক মামা। তোমার যদি এতই কথা বলতে ইচ্ছা করে তাহলে অন্য কিছু নিয়ে কথা বল।'

'অন্য কি নিয়ে কথা বলব?'

'ছবি নিয়ে কথা বল। বাবা জান! মামা ছবি বানাবে, শর্ট ফ্লিম। ছবিটা দারুণ একটা কিছু হবে।'

সোবাহান সাহেব বললেন, ভাল। বলেই প্লেট সরিয়ে উঠে পড়লেন। মিলি বলল, বাবার খাওয়াটা তুমি নষ্ট করলে মামা।

'আমি কারো খাওয়া নষ্ট করিনি। পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দুলাভাইকে পরাস্ত করেছি। অবশ্যি তাঁকে পরাস্ত করা সহজ। তাঁর আই কিউ খুবই নিচের দিকে। আমার মনে হয় গাছ পালার আই কিউ এর কাছাকাছি।'

'তোমার আই কিউ বুঝি আইনস্টাইনের মত?'

'আমি কারো সঙ্গে তুলনায় যেতে চাচ্ছি না তবে বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষেত্রে ১০০র ভেতর আমাকে ৯৩ থেকে ৯৫ দিতে পারিস।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আর তোর বুদ্ধি হচ্ছে ৫৬ থেকে ৬২র মধ্যে। আর একই স্কেলে দুলাভাইয়ের বুদ্ধি ১৮ থেকে ২২র মধ্যে উঠানামা করে।'

তোমার তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ এবং আমি আমার ধারণার কথা বলতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করি না। কারণ সত্য হচ্ছে আগুণের মত। আগুণ চাপা দেবার কোন উপায় নেই। আমি বুঝতে পারছি দুলাভাইয়ের বুদ্ধি কম বলায় তুই আহত হয়েছিস, কিন্তু উপায় কি যা সত্যি তা বলতেই হবে। আমার মুখ হয়তবা তুই বন্ধ করতে পারবি, কিন্তু পাবলিকের মুখ তুই কি করে বন্ধ করবি? পাবলিক এক সময় সত্যি কথা বলবেই।'

'বকবকানি থামাও তো মামা।'

'থামাচ্ছি। কিন্তু প্রসঙ্গটা যখন উঠলই তখন এই বাড়িতে আমার পরই কার আই কিউ বেশি সেটা জানা থাকা ভাল। আমার পরই আছে কাদের। অসাধারণ ব্রেইন।'

চুপ করতো মামা। অসাধারণ ব্রেইন হল কাদেরের!'

'প্রপার এডুকেশন পেলে এই ছেলে ফাটাফাটি করে ফেলত।'

'তুমিতো প্রপার এডুকেশন পেয়েছ। তুমি কি করেছ?'

'করব। সময়তো পার হয়ে যায় নি। দেখবি দেশ জুড়ে একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে। তোদের এই বাড়ি বিখ্যাত হয়ে যাবে। লোকজন এসে বলবে– এটা একটা বিখ্যাত বাড়ি। তোদের বই লিখতে হবে– 'মামাকে যেমন দেখেছি' কিংবা ''কাছের মানুষ ফরিদ মামা'–।

'কিছু মনে করো না, আমার ধারণা তোমার আই কিউ খুবই কম।

ফরিদ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল। তার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা তাকে খুব মজা দেয়। এটা হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাধারণ ট্র্যাজেডি। প্রিয়জনরা তাদের বুঝতে পারে না। আড়ালে হয়তবা হাসাহাসিও করে। করুক। তাদের হাসাহাসিতে কিছু যায় আসে না।

কাদের এসে ঢুকল। গম্ভীর মুখে ঘোষণা করল, নতুন ভাড়াটে চলে এসেছে। সে মুখ কুঁচকে বলল, এক মালগাড়িতে বেবাক জিনিস উপস্থিত। ফকির‍্যা পার্টি।

বলেই সে আবার বারান্দায় চলে গেল। নতুন ভাড়াটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। ফুলের গাছ টাছ না ভেঙ্গে ফেলে। এই বাড়িতে তার অবস্থান সম্পর্কেও জানিয়ে দেয়া দরকার। ভাড়াটে যদি তাকে সামান্য একজন কাজের মানুষ মনে করে তাহলে মুশকিল। প্রথম দর্শনে মনে করে ফেললে সারাজীবনই মনে রাখবে। যখন তখন ডেকে বলবে, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাওতো, চিঠিটা পোষ্ট করে দাওতো, এক দৌড়ে খবরের কাগজটা এনে দাও।

আনিস রিক্সা করে এসেছে। টগর এবং নিশা দু'জনেই গভীর ঘুমে। মিলিদের বসার ঘরের দরজা খোলা। আনিস বাচ্চা দু'টিকে বসার ঘরের সোফায় শুইয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল। কাদেরের দিকে তাকিয়ে বলল, কাদের তুমি স্যুটকেস দু'টা উপরে দিয়ে আসতো।

কাদের তৎক্ষণাৎ বলল, কুলীর কাম আমি করি না ভাইজান। সৈয়দ বংশ।

'বখশীস পাবে।'

'এই বংশের লোক বখশীসের লোভে কিছু করে না ভাইজান। আমরা হইলাম আসল সৈয়দ। বোগদাদী সৈয়দ।'

আনিস নিজেই জিনিষপত্র টানাটানি করে তুলতে লাগল। ঠেলাগাড়ির লোক দু'টি উপরে কিছু তুলবে না। দোতলার ছাদে তোলা হবে এই কথা তাদের বলা হয়নি। এখন যদি তুলতে হয় পঞ্চাশ টাকা বাড়তি দিতে হবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে আনিসের হাতে এই মুহূর্তে পঞ্চাশটা টাকাও নেই। এ বাড়িতে সে কপর্দক শূন্য অবস্থাতেই এসে উঠেছে।

মিলি কি করতে জানি বসার ঘরে ঢুকেছিল। সোফাতে দু'টি শিশুকে শুয়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে এল। আহ্ কি মায়া কাড়া চেহারা। দু'টি দেবশিশু যেন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। মেয়েটির মাথাভর্তি রেশমী চুল। চোখের ভুরুগুলি যেন কোন চৈনিক শিল্পী সূক্ষ্ম তুলী দিয়ে এঁকেছে। কমলার কোয়ার মত পাতলা ঠোঁট বার বার কেঁপে উঠছে। বাচ্চাটিকে কোলে নেবার এমন ইচ্ছা হচ্ছে যে মিলির রীতিমত লজ্জা লাগছে। মিলি দোতলার ছাদে উঠে গেল। আনিস খাটের ভারী একটা অংশ টেনে টেনে তুলছে।

মিলি বলল, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? আপনার ঠেলাগাড়ির লোকজন কোথায়?

'ওরা চলে গেছে।'

'দাঁড়ান আমি কাদেরকে পাঠাচ্ছি।'

'না থাক। বেচারা সৈয়দ বংশের মানুষ কুলীর কাজ করবে না। আমার অসুবিধা হচ্ছে না। তুলে ফেলেছি।'

'তাইতো দেখছি। আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'ও আসে নি।'

'আসে নি মানে?' মা'কে ছাড়াই বাচ্চা দু'টি চলে এসেছে?'

'হু।'

'উনাকে কবে আনবেন?'

'তাকে আনা সম্ভব হবে না। সে আসবে না।'

'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ও মারা গেছে।'

বেশ কিছুক্ষণ সময় মিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এত বড় একটা খবর তার হজম করতে সময় লাগল। মিলি বলল, বাচ্চা দু'টির মা নেই শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। এটা নিয়ে আপনি রহস্য করবেন তা ভাবিনি। আপনি হয়ত খুব রসিক মানুষ, সব কিছু নিয়ে রসিকতা করা হয়ত আপনার অভ্যাস কিন্তু এটা অন্যায়।

আনিস বলল, ঠিক এই ভাবে কিছু বলিনি। ওর মৃত্যুর কথা সরাসরি বলতে খারাপ লাগে বলেই অন্য পথে বলতে চেষ্টা করি।

'আর করবেন না।'

'আচ্ছা আর করব না।'

আনিস মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করল মিলি নামের এই মেয়েটি তার ঘর গুছিয়ে দিল। মশারি খাটিয়ে দিল, টগর এবং নিশাকে কোলে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। মেয়েরা প্রাকৃতিক নিয়মেই মমতাময়ী, কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে মমতার পরিমাণ অনেক অনেক বেশি।

আনিস বলল, আপনাকে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে ফেললাম।

'তা ঠিক। কাল সকালেই আমার টিউটোরিয়াল। কিছুই করা হয় নি।'

'আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন কাজেই আমি আপনার ক্ষুদ্র একটা উপকার করতে চাই। এ গুড টার্ণ ফর এ গুড টার্ণ।,

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কি উপকার করতে চান?

'একটা উপদেশ দিতে চাই যা আপনার খুব কাজে আসবে। উপদেশটা হচ্ছে আমার বাচ্চা দু'টিকে একেবারেই পাত্তা দেবেন না।'

'সে কি!'

'ওদের একজনই আপনাকে পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। দু'জন মিলে কি করবে তার বিন্দু মাত্র ধারণাও আপনার নেই। কাজেই সাবধান।'

মিলি হাসল। আনিস বলল, আপনার হাসি দেখেই বুঝতে পারছি আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। সাবধান করে দেবার দরকার ছিল করে দিয়েছি।

সোবাহান সাহেবকে ডাক্তার বলে দিয়েছেন রাত ঠিক দশটায় বিছানায় চলে যেতে। রাত জাগা পুরোপুরি বারণ। ডাক্তারের উপদেশ মত কিছুদিন তাই করলেন। দেখা গেল রাত দশটার দিকে ঘুমুতে গেলে ঘুম আসে দেড়টা দু'টার দিকে অথচ বারটার দিকে ঘুমুতে গেলে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘুম চলে আসে। কিছুদিন হল তিনি তার নিজস্ব নিয়ম চালু করেছেন– রাত বারোটায় ঘুমুতে যান। তবে তিনি জানেন না যে শোবার ঘরের ঘড়ি এক ফাঁকে মিলি এসে এক ঘন্টা আগিয়ে রাখে।

শোবার ঘরের ঘড়িতে এখন বারোটা বাজছে। যদিও আসল সময় রাত এগারোটা। মিনু ঘরে ঢুকলেন। হাতে বরফ শীতল এক গ্লাস পানি। বিছানায় যাবার আগে সোবাহান সাহেব ঠান্ডা এক গ্লাস পানি খান। মিনু পানির গ্লাস টেবিলের পাশে রাখতে রাখতে বললেন, ঘুমুবে না?

সোবাহান সাহেব বললেন, একটু দেরী হবে মিনু। তুমি শুয়ে পড়।

'দেরী হবে কেন?'

'একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি।'

'কি নিয়ে ভাবছ?'

'দেশে মাছের যে ভয়াবহ সমস্যা ঐটা নিয়ে ভাবছি। কি করা যায় তাই—'

'ঐ সব ভাববার লোক আছে। তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'এইতো একটা ভুল কথা বললে মিনু। দেশের সমস্যা নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। সবাই যদি ভাবে তাহলেই সমস্যার কোন একটা সমাধান বের করা যাবে।'

'বেশতো সকাল বেলা সমাধান বের করবে। বারটা বাজে, এখন শুয়ে পড়। নাও পানিটা খাও।'

সোবাহান সাহেব চোখ থেকে চশমা খুলে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, ঘড়িতে বারটা বাজে না, বাজে এগারোটা। তোমরা এই ঘরের ঘড়ি এক ঘন্টা আগিয়ে দাও। যেদিন প্রথম করলে সেদিনই টের পেয়েছি। তোমাদের বুঝতে দেই নি। তোমরা যা করছ, আমার প্রতি মমতা বশতই করছ তবু কাজটা ঠিক না। তোমরা ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ। ধোঁকা দেয়া অন্যায়। যাও শুয়ে পড়।

মিনু কথা বাড়ালেন না, শুয়ে পড়লেন। স্বামীকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। এই মুহূর্তে তাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

'মিনু।'

'বল।'

'আচ্ছা বলতো তোমরা কি আমাকে খুব অল্প বুদ্ধির মানুষ বলে মনে কর?'

'তা মনে করব কেন?'

'এই যে ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা আগিয়ে দিলে, মনটাই একটু খারাপ হল। তোমরা আমাকে নিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার করছ।'

'মিলি করেছে। এই সব মিলির বুদ্ধি। দাও এক্ষুণী ঠিক করে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই। আমার ঘরের ঘড়ি এক ঘন্টা এগিয়েই থাকুক। আমি মানুষটা অবশ্যি অনেকখানি পিছিয়ে আছি। এই দিক দিয়ে ঠিকই আছে। তুমি ঘুমাও মিনু। বয়সতো শুধু আমার একার বাড়ছে না, তোমারও বাড়ছে। আমার যেমন বিশ্রাম দরকার, তোমারও দরকার। সমাজটাই এমন যে পুরুষের প্রয়োজনটাই বড় করে দেখা হয়। মেয়েদেরটা দেখা হয় না। এই সমস্যা নিয়েও ভাবতে হবে।'

সোবাহান সাহেব নিজেই উঠে ঘরের বাতি নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে চেয়ারে বসলেন। তাঁর সামনে একটা বিশাল খাতা। খাতায় লেখা–মৎস্য সমস্যা।

খাতার প্রথম পাতায় এদেশের সব রকম মাছের নাম লেখা আছে। দেশে কত ধরনের মাছ পাওয়া যায়, কোন অঞ্চলে কোন মাছের কি নাম সব আগে লেখা দরকার। সব জাতের মাছের ব্রিডিং টাইম কি এক–না একেক মাছের একেক সময় তাও জানা দরকার। মাছের খাবার কি?

সোবাহান সাহেবের মন খারাপ লাগছে, তিনি মাছের দেশের মানুষ অথচ মাছের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানেন না। শুধু জানেন বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে যখন আকাশ গুড় গুড় করে উঠে তখন কৈ মাছের ঝাঁক পানি ছেড়ে শুকনোয় উঠে আসে। রহস্যময় ব্যাপার। এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কত অদ্ভুত রহস্য চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁকে চিনতে হবে এইসব রহস্যের মাঝে।

বারান্দায় মিলি হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে গাইছে। মেয়েটার গানের গলা চমৎকার অথচ ভাল করে গান শিখল না। তাঁর ইচ্ছা করল মেয়েকে ডেকে পাশে বসিয়ে গান শুনেন। তা সম্ভব হবে না। গাইতে বললে মিলি গাইতে পারে না। সে না –কি গান করে নিজের জন্যে, অন্য কারো জন্যে না।

মিলি গাইছে–

বলি গো সজনী যেয়ো না, যেয়ো না
তার কাছে আর যেয়ো না।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলো না বোলো না।।

সুন্দর গানতো। সোবাহান সাহেবের মন আনন্দে পূর্ণ হল। তিনি খাতা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মিলি রেলিং–এ হেলান দিয়ে আছে। আকাশ ভরা জোছনা। কি অপরূপ ছবি। এমন সুন্দর পৃথিবী ফেলে রেখে তাঁকে চলে যেতে হবে ভাবতেই কষ্ট হয়। স্বর্গ কি এই পৃথিবীর চেয়েও সুন্দর হবে? তাও কি সম্ভব?

মিলি গান বন্ধ করে বাবার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল, আমার মন অসম্ভব খারাপ হয়ে আছে বাবা।

'কেন?'

'কাল আমার টিউটোরিয়েল, কিছু পড়া হয় নি। পড়তে ভাল লাগে না, কি–যে করি।'

সোবাহান সাহেব সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। মিলি বলল, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা আমরা পড়া লেখা করে নষ্ট করি। কোন মানে হয় না।

৫

নিরিবিলি বাড়ির সবচে সরব মহিলা–রহিমার মার মুখে আজ সারাদিন কোন কথা নেই। মিনু ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রহিমার মা?

রহিমার মা থমথমে গলায় বলল,.কিছু হয় নাই। গরীবের আবার হওয়া হওয়ি। গরীবের কিছুই হয় না।

মিনু আর তাকে ঘাঁটালেন না। চুপচাপ আছে ভাল আছে, কথা বলা শুরু করলে মুশকিল।

সন্ধ্যায় চা বানাতে বানাতে রহিমার মা নিজের মনেই বলল, গরীবের দুঃখু কেউ বুঝে না। মাইনষেতো বুঝেই না আল্লায়ও বুঝে না।

খুবই ফিলসফিক কথা। এ জাতীয় কথাবার্তা বলা শুরু করলে বুঝতে হবে ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে।

যা ঘটেছে তাকে ভয়াবহ বলা ঠিক হবে না। ঘটনা ঘটেছে গত রাতে। কাদের এবং রহিমার মা এক ঘরে ঘুমোয়। কাজকর্ম শেষ করে রাত এগারোটার দিকে রহিমার মা ঘুমুতে এসে দেখে কাদের জেগে বসে আছে। কাদেরের চোখে নতুন চশমা। কাদেরকে কেমন ভদ্রলোক ভদ্রলোক লাগছে। কাদের বলল, কেমন দেহায় খালাজী?

রহিমার মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না। বিস্ময় সামলাতে সময় লাগল।

'চশমা কই পাইছস?'

'কিনলাম। একশ দশ টেকা দাম। টেকা পয়সার দিকে চাইলেতো হয় না খালাজী। টেকা পয়সা হইল বটপাতা। আইজ আছে কাইল নাই। জেবন তো বটপাতা না। জেবনের সাধ আহ্লাদ আছে। কি কন খালাজী?'

রহিমার মা জবাব দিল না। কাদের চোখ থেকে চশমা খুলে গম্ভীর ভঙ্গিতে কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বলল, জিনিসটার প্রয়োজনও আছে খালাজী। চেহারা সুন্দরের কথা বাদ দিলেও জিনিসটার বড়ই দরকার। চউক্ষে ধূলাবালি পড়ে না। রইদ কম লাগে। চউক্ষের আরাম হয়।

'দাম কত কইলি?'

'একশ দশ। পাওয়ার দিলে আরো বেশী পড়ত। বিনা পাওয়ারে নিলাম। বুড়াকালে পাওয়ার কিনমু।'

রহিমার মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আটকে রাখতে পারল না। এই কাদের ছোকরা বড়ই শৌখিন। বেতনের টাকা পেলেই এটা ওটা কিনে ফেলে। গত মাসে কিনেছে কলম। কলম কিনে এনে গম্ভীর গলায় বলেছে, কলম কিনলাম একটা খালাজী, চাইনীজ।

রহিমার মা অবাক হয়ে বলেছে, কলম দিয়া তুই করবি কি? লেহা পড়া জানছ?

কাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে লেহাপড়া কপালে নাই করমু কি কন? লেহাপড়া না জানলেও কলম একটা থাকা দরকার। পকেটে কলম থাকলে বাইরের একটা লোক ফট কইরা তুমি বইল্যা ডাক দিব না। বলব, ভাইসাব।

রহিমার মা'রও খুব শখ ছিল একটা কলম কেনার। তবে কাদের যেমন কলম পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারে সে তা পারবে না জেনে কেনে নি। এখন আবার চশমা কিনে ফেলেছে। ঈর্ষায় রহিমার মা'র চোখ জ্বালা করতে লাগল।

কাদের বলল, দেহায় কেমন খালাজী?

রহিমার মা বিরক্ত মুখে বলল, যেমুন চেহারা তেমুন দেহায়। ভ্যান ভ্যান করিস না।

আয়নায় অনেকক্ষণ কাদের নিজেকে দেখল। তারপর বারান্দায় একটু হেঁটে আসল। চশমা পরার পর তার হাঁটার ভঙ্গিও বদলে গেছে।

সেই রাতে মনের কষ্টে রহিমার মার ঘুম হল না। তার মেজাজ খারাপের এই হচ্ছে পূর্ব ইতিহাস। মিনু পূর্ব ইতিহাস জানেন না। কাজেই রহিমার মা যখন এসে তাঁকে বলল, ''আমার চউক্ষে যেন কি হইছে আম্মা,'' তখন তিনি সঙ্গত কারণেই চিন্তিত হয়ে বললেন, কি হয়েছে?

'চউখ খালি কড়্ কড়্ করে।'

'তাই না–কি?'

'আবার চিলিক দিয়া বেদনা হয়।'

'ডাক্তার দেখাও।'

'ডাক্তার লাগতো না আম্মা। চশমা দিলে ঠিক হইব। চশমার দাম বেশী না–একশ দশ। কাদের কিনছে।'

'কাদের চশমা কিনেছে?'

'জ্বি আম্মা। জেবনের একটা সাধ আহ্লাদ আছে না?'

মিনু বিরক্ত হয়ে বললেন, কাদের যা করে তোমাকে তাই করতে হবে? তুমি বড় যন্ত্রণা কর রহিমার মা।

'কয় দিন আর বাঁচমু আম্মা কন?'

'আচ্ছা ঠিক আছে যাও চশমা দেয়া হবে।'

রহিমার মা'র চোখে আনন্দে পানি এসে গেল।

চশমা এল তার পরের দিন। রহিমার মা মুগ্ধ। আয়নায় সে নিজেকে চিনতে পারে না। কাদের বলল, ময়লা শাড়িডা বদলাইয়া একটা ভাল দেইখ্যা শাড়ি পরেন খালা। চশমার একটা ইজ্জত আছে।

রহিমার মা তৎক্ষণাৎ শাড়ি বদলে গত ঈদে পাওয়া সাদা শাড়ি পরে ফেলন। নতুন শাড়ি এবং চশমার কারণে ছোট খাট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

মনসুর বিকেলে এসেছে। তাকে খবর দেয়া হয় নি, নিজ থেকেই এসেছে। এ বাড়িতে আসবার জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে একটা অজুহাতও তৈরী করেছে। অজুহাত খুব যে প্রথম শ্রেণীর তা নয় তবে মনসুরের কাছে মনে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর। সে ঠিক করে রেখেছে মিলিকে বলবে, আজ আমার জন্মদিন। কাজেই এ বাড়ীর মুরুব্বীদের দোয়া নিতে এসেছি। জন্মদিনের কথায় সবাই খানিকটা দুর্বল হয়। মিলিও নিশ্চয়ই হবে। যতক্ষণ কথা বলার প্রয়োজন তার চেয়েও কিছু বেশি কথা বলবে। চা নাশতা দেবে। একটা মানুষতো আর একা একা বসে চা খাবে না। মিলি বসবে তার সামনে। কি ধরনের কথা সে মিলির সঙ্গে বলবে তাও মোটামুটি ঠিক করা। কয়েকটা হাসির গল্প বলে মিলিকে হাসিয়ে দিতে হবে। মেয়েরা রসিক পুরুষ খুব পছন্দ করে। হাসির গল্প সে নিজেও পছন্দ করে কিন্তু তেমন বলতে পারে না।

মনসুর দরজার বেল টিপল। দরজা খুলে দিল রহিমার মা। তার চোখে চশমা, পরনে ইস্ত্রী করা ধবধবে সাদা শাড়ি। মিলি সোফায় বসে কি একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

মনসুর রহিমার মার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, আজ আমার জন্মদিন।

রহিমার মা এবং মিলি দু'জনই বিস্মিত হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল। মনসুর মুখের হাসি আরও বিস্তৃত করে বলল, ভাবলাম জন্মদিনে মুরুব্বীদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে যাই। আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন–

এই বলেই মনসুর নীচু হয়ে রহিমার মা–র পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল।

মিলি তার হতভম্ব ভাব সামলে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, রহিমার মা যাও'তো ডাক্তার সাহেবের জন্যে চা নিয়ে এসো।

রহিমার মা চলে যেতেই মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, মনে হচ্ছে একটা ভুল হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ কিছুটা হয়েছে। আপনি মুরুব্বীদের দোয়া নিতে এসেছেন। রহিমার মা বয়সে আপনার অনেক অনেক বড় সেই হিসেবে মুরুব্বী–কাজেই এত আপসেট হচ্ছেন কেন? বসুন। যা হবার হয়ে গেছে।'

'জ্বি না। বসব না। কাইন্ডলি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি যদি খাওয়ান। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি বসুন। পৃথিবী উল্টে যাবার মত কিছু হয় নি। এ রকম ভুল আমরা সব সময় করি।'

মিলি ভেতর থেকে ঠান্ডা পানি এনে দেখল ডাক্তার নেই। এই প্রথম ডাক্তার ছেলেটির জন্যে সে এক ধরণের মায়া অনুভব করল। তার ইচ্ছা করতে লাগল কাদেরকে পাঠিয়ে মনসুরকে ডেকে আনায়। চা খেতে খেতে দু'জনে খানিকক্ষণ গল্প করে। বেচারা বড় লজ্জা পেয়েছে।

৬

দুপুরের খাওয়ার পর ফরিদ টানা ঘুম দেয়। বাংলাদেশের জল হাওয়ার জন্যে এই ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তার ধারণা। এতে মেজাজের উগ্র ভাবটা কমে যায়–স্বভাব মধুর হয়। ফরিদের ধারণা জাতি হিসেবে বাঙ্গালী যে ঝগড়াটে হয়ে যাচ্ছে তার কারণ এই জাতি দুপুরে ঠিক মত ঘুমুতে পারছে না।

তার ঘুম ভাঙ্গল বিকেল চারটায়। চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখল সাত আট বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে এবং চার পাঁচ বছরের পরীর মত একটি মেয়ে পা তুলে তার খাটে বসে আছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শিশুদের ফরিদ কখনো পছন্দ করে না। শিশু মানেই যন্ত্রণা। ফরিদের ভুরু কুঞ্চিত হল। সে গম্ভীর গলায় বলল, তোমরা কে?

ছেলেটি তার চেয়েও গম্ভীর গলায় বলল, আমরা মানুষ।

'এখানে কি চাও?'

'কিছু চাই না।'

ছোট মেয়েটি বলল, আপনি আমাদের ধমক দিচ্ছেন কেন? ধমক দিলে আমরা ভয় পাই না।

'নাম কি তোমার?'

'আমার নাম নিশা, ওর নাম টগর। ও আমার ভাই।'

'এখন আমার ঘর থেকে যাও।'

'আপনার নাম কি?'

'এতো দেখি বড় যন্ত্রণা হলো।'

'আমাদের নাম জিজ্ঞেস করেছেন আমরা বললাম, এখন আপনার নাম জিজ্ঞেস করছি আপনি বলবেন না কেন?'

'আমারনাম ফরিদ।'

'আপনাকে কি বলে ডাকব?'

'কিছু ডাকতে হবে না।'

'বড়দের কিছু ডাকতে হয়, চাচা, মামা, খালু এইসব।'

'বললাম তো কিছু ডাকতে হবে না।'

'নাম ধরে ডাকব?'

'আরে বড় যন্ত্রণা করছে তো! নাম বিছানা থেকে। নাম।'

টগর এবং নিশা গম্ভীর মুখে নামল। ঘর থেকে বের হল কিন্তু পুরোপুরি চলে গেল না, পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে পর্দা সরিয়ে মুখ দেখায় এবং জীব বের করে ভেংচি কাটে আবার মুখ সরিয়ে নেয়। রাগে ফরিদের সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। এত সাহস এই দুই বিচ্ছুর! এল কোত্থেকে এইগুলি? খুব সহজে এগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এরা তার হাড় ভাজা ভাজা করে দেবে। সে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে শিশুদের সঙ্গে তার এক ধরনের বৈরী সম্পর্ক আছে। শিশুরা তাকে নানান ভাবে যন্ত্রণা দেয়।

ফরিদ ডাকল, কাদের কাদের।

অবিকল ফরিদের মত করে টগর বলল, কাদের–কাদের।

ফরিদ চেঁচিয়ে বলল, এই বিচ্ছু দু'টাকে ঘাড় ধরে বের করে দেতো কাদের।

ছোট মেয়েটি ফরিদের মত করে বলল, এই বিচ্ছু দু'টাকে ঘার ধরে বের করে দেতো।

ফরিদ প্রচন্ড ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'উফ!'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলল–'উফ!'

টগর এবং নিশা এখন যে খেলাটা খেলছে তার নাম 'নকল খেলা।' এই খেলা হচ্ছে মানুষকে রাগিয়ে দেবার খেলা। যাকে রাগিয়ে দেয়া দরকার তার সঙ্গে এই খেলা খেলতে হয়। সে যা বলে তাই বলতে হয়। অবশ্যি বড়দের সঙ্গে এই খেলা খেলতে নেই। তবে টগর এবং নিশা দু'জনেরই মনে হচ্ছে এই মানুষটা বড় হলেও তার মধ্যে শিশু সুলভ একটা ব্যাপার আছে। তার সঙ্গে এই খেলা অবশ্যই খেলা যায়।

ফরিদ বিছানায় উঠে বসল। চাপা গলায় বলল, শিশুরা শোন, আমি কিন্তু প্রচন্ড রেগে যাচ্ছি।

নিশা বলল, শিশুরা শোন, আমি কিন্তু প্রচন্ড রেগে যাচ্ছি।

ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। টগর অবিকল তার মত ভঙ্গিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বোনকে নিয়ে চলে গেল। দুই বিচ্ছু চলে গেছে দেখেও ফরিদের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে এক্ষুণী এই দুইজন ফিরে আসবে।

রাতে রহিমার মা কাঁদো কাঁদো গলায় মিনুকে বলল, আম্মা বড় বিপদে পড়ছি।

মিনু বললেন, কি বিপদ?

'নতুন ভাড়াইট্যার পুলা আর মাইয়া দুইটা বড় যন্ত্রণা করে।'

'কি যন্ত্রণা করে?'

'আমি যে কথাটা কই হেরাও হেই কথাটা কয়। ভেংগায় আম্মা।'

বলতে বলতে রহিমার মা কেঁদে ফেলল। মিনু অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, ছোট দু'টা বাচ্চা কি করেছে না করেছে এতে একেবারে কেঁদে ফেলতে হবে? বাচ্চারা এরকম করেই। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে আসবে না।

টগর এবং নিশা যা করছে তাকে ঠিক সামান্য বলে উড়িয়ে দেবার পথ নেই। তারা বারান্দায় রাখা সোবাহান সাহেবের গড়গড়ায় তামাক টেনেছে। গেট বেয়ে দেয়ালের মাথায় চড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেছে। মিনুর পানের বাটা থেকে জর্দা দিয়ে পান খেয়ে বমি করে ঘর ভাসিয়েছে। খাবার ঘরের সবগুলি চেয়ার একত্র করে রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলা খেলেছে। মিনু ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারেন নি বরং মায়ায় তাঁর মন ভরে গেছে। এই বয়সে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বেড়ানো বেশ শক্ত, তবু তিনি দীর্ঘ সময় নিশাকে কোলে নিয়ে বেড়ালেন। নিশা দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রইল। টগর বলল, তুমি আমাকে কখন কোলে নেবে? আমার ওজন বেশী না, নিশার চেয়ে মাত্র পাঁচ পাউন্ড বেশী।

এরকম বাচ্চাদের উপর কি কেউ রাগ করতে পারে?

৭

সোবাহান সাহেব তাঁর মাছের সমস্যা নিয়ে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন। মাছ সম্পর্কে জানার জন্যে তিনি ময়মনসিংহের এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির ফিসারি ডিপার্টমেন্টে টেলিফোন করেছিলেন। দেখা গেল তারা আমেরিকার মাছ সম্পর্কে প্রচুর জানেন। দেশী মাছ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। বই পত্রও নেই। সোবাহান সাহেব বললেন, বিদেশী মাছ সম্পর্কে জেনে কি হবে?

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগী গলায় বললেন, দেশী বিদেশী প্রশ্ন তুলছেন কেন? আমরা মাছ সম্পর্কে জানি, একটা স্পেসিস সম্পর্কে জানি। দেশী মাছ সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানি না তাওতো না। বই পত্র লেখা হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে।

'কি গবেষণা হচ্ছে?'

'কি গবেষণা হচ্ছে তা আপনাকে বলতে হবে না–কি?'

'কেন হবে না?' আমি একজন নাগরিক। আমাদের টাকায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে। কাজেই আমাদের জানার অধিকার আছে।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে আগুন হয়ে বললেন, অধিকার ফলাবেন না।

'কেন অধিকার ফলাব না? আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন? এ রকম রেগে গেলে ছাত্র পড়াবেন কিভাবে?'

'আমার ছাত্র পড়ানো নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'কেন হবে না?'

অধ্যাপক ভদ্রলোক খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। সোবাহান সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগেও চেষ্টা করলেন। সেখানেও এই অবস্থা। অধ্যাপকরা অত্যন্ত সন্দেহজনক ভঙ্গিতে জানতে চান–আপনি কে? মাছ সম্পর্কে জানতে চান কেন?

সোবাহান সাহেব মৎস্য বিভাগের অফিসে গেলেন। সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। বড় দরের সব অফিসাররাই হয় মিটিং এ নয় সেমিনারে, কয়েকজন দেশের বাইরে। এরচে ছোটপদের অফিসাররা হয় ট্যুরে কিংবা ব্যস্ত। একজনকে পাওয়া গেল তিনি তেমন ব্যস্ত না। চা খেতে খেতে চিত্রালী পড়ছেন। সোবাহান সাহেব হুট করে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোক বিরক্ত মুখে বললেন, কি চান?

'মাছ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'কেন?'

'কারণ আপনারা মৎস্য বিভাগের লোক।'

'বলুন কি ব্যাপার।'

'আপনি পত্রিকাটা আগে পড়ে শেষ করুন তারপর কথা বলব।'

ভদ্রলোক পত্রিকা নামিয়ে কঠিন চোখে তাকালেন। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, বলুন কি বলতে চান।

সোবাহান সাহেব বললেন, দেশে এই যে মাছের তীব্র অভাব তাই নিয়ে ক'দিন ধরে চিন্তা ভাবনা করছিলাম।

'আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে বলেছে কে?'

সোবাহান সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি কি দেশের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারব না?

'অবশ্যই পারবেন। চিন্তা করে কি পেলেন সেটা যদি অল্প কথায় বলতে পারেন, বলুন। গল্প করলেতো আমাদের চলে না, অফিসের কাজকর্ম আছে।'

'আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমরা যদি এক বৎসর মাছ না খাই। যদি মাছরা একটা বৎসর নির্বিঘ্নে বংশ বিস্তার করতে পারে তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'ভাল কথা এটা আমাকে বলছেন কেন?'

'আপনাকে বলছি কারণ আপনারা যদি জনগণকে বোঝাতে পারেন, মাছ না খাওয়ার একটা ক্যাম্পেইন যদি করেন তাহলে-'

'আপনি একটা কথা বলবেন আর ওম্নি আমরা ঢাক ঢোল নিয়ে সেই কথা প্রচারে লেগে যাব, এটা মনে করলেন কেন?'

'আমার কথায় যদি যুক্তি থাকে তাহলে আপনারা কেনইবা প্রচার করবেন না?'

'আপনার কথায় কোনই যুক্তি নেই।'

'যুক্তি নেই?'

'জ্বি না। প্রথমত দেশে মাছের কোন অভাব নেই। সরকার মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে সব প্রকল্প হাতে নিয়েছেন সেই সব প্রকল্প খুব ভাল কাজ করছে। ফিস প্রোটিনে আমরা এখন স্বয়ং সম্পূর্ণ।'

'স্বয়ং সম্পূর্ণ?'

'অবশ্যই। বিদেশেও আমরা মাছ রপ্তানী করছি। চিংড়ি মাছ এক্সপোর্ট করে কি পরিমাণ ফরেন এক্সচেঞ্জ আমাদের আসে আপনি জানেন?'

'জ্বি না।'

'আপনার জানার দরকারও নেই। আজে বাজে জিনিস নিয়ে মাথা গরম করবেন না এবং আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

সোবাহান সাহেবের মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সামনে বসা ভদ্রলোক সিনেমা পত্রিকাটি মুখের উপর তুলে ধরতে ধরতে নিজের মনে বললেন, পাগল ছাগলে দেশ ভর্তি হয়ে গেছে।

সোবাহান সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, আপনি আমাকে পাগল বললেন?

'আরে না ভাই আপনাকে বলি নাই। দেশে আপনি ছাড়াও তো আরো পাগল আছে? আচ্ছা এখন যান স্লামালিকুম।'

সোবাহান সাহেব ঘরে ফিরলেন প্রবল জ্বর নিয়ে। বাড়ির গেটের সামনে মিলি দাঁড়িয়েছিল, সে বাবাকে দেখে চমকে উঠে বলল, তোমার এই অবস্থা কেন বাবা? কি হয়েছে?

সোবাহান সাহেব জড়ানো গলায় বললেন, আমাকে পাগল বলেছে। মুখের উপর পাগল বলেছে।

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কে তোমাকে পাগল বলেছে?

'কে বলেছে সেটাতো ইম্পর্টেন্ট না। পাগল বলেছে এটাই ইম্পর্টেন্ট।'

'মোটেই না বাবা। পাগল কোন গালাগালি নয়। পাগল হচ্ছে আদরের ডাক। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাবান লোকদের আদর করে পাগল ডাকা হয়।'

মেয়ের কথায় সোবাহান সাহেব খুব যে একটা সান্তনা পেলেন তা নয়। রাতে ভাত খেলেন না। সন্ধ্যার পর পরই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন। মানুষের কুৎসিত রূপ তাঁকে বড় পীড়া দেয়।

ফরিদ রাতের খাওয়া শেষে দুলাভাইকে দেখতে এল। বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল, কে নাকি আপনাকে পাগল বলেছে, আর তাতেই আপনি চুপসে গেছেন।

'তোমাকে পাগল বললে কি তুমি খুশী হতে?'

'আমাকে বললে আমি ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতাম। যদি দেখতাম আমাকে পাগল বলার পেছনে যুক্তি আছে, তাহলে সহজভাবে ট্রুথকে একসেপ্ট করতাম। এখন আপনি বলুন, কেন সে আপনাকে পাগল বলল? আপনি কি করেছিলেন বা কি বলেছিলেন?'

'আমি শুধু বলেছিলাম এক বৎসর যদি আমরা মাছ না খাই তাহলে মাছরা নির্বিঘ্নে বংশ বিস্তার করবে। মাছের অভাব দূর হবে।'

'এই বলায় সে আপনাকে পাগল বলল?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ ভদ্রলোকের উপর আমার রেসপেক্ট হচ্ছে দুলাভাই। আপনাকে পাগল বলার তার রাইট আছে। এরচে খারাপ কিছু বললেও কিছু করার ছিল না। একটা মাছের পেটে কতগুলি ডিম থাকে? মাঝারি সাইজের একটা ইলিশ মাছে ডিম থাকে নয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার। মাছের সব ডিম ফুটে যদি বাচ্চা হয়, মাছের কারণে তাহলে নদী নালা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রবল বন্যা হবে। মাছ চলে আসবে ক্ষেতে খামারে। ক্ষুধার্থ মাছ সব ফসল খেয়ে শেষ করে ফেলবে। পুরো দেশ চাপা পড়ে যাবে এক ফুট মাছের নীচে। কি ভয়াবহ অবস্থা চিন্তা করে দেখুন দুলাভাই।

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মনে মনে বললেন, গাধার গাধা। ঘর অন্ধকার বলে ফরিদ সোবাহান সাহেবের তীব্র বিরক্তি টের পেল না। সে মহা উৎসাহে বলে চলল, আপনি মনে হয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না, কিংবা বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করছেন না। আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। ধরুন আমাদের দেশে মাছের মোট সংখ্যা একশ কোটি। খুব কম করে ধরলাম, মোট সংখ্যা তারচে অনেক বেশী। একশ কোটি মানে টেন টু দি পাওয়ার এইট। টেন বেস লগারিদমে এটা হল-আট। এই মাছের অর্ধেক যদি স্ত্রী মাছ হয় তাহলে টেন বেস লগে কি দাঁড়ায়? আচ্ছা এক কাজ করা যাক, টেন বেস না ধরে নেচারেল লগারিদমে নিয়ে আসি। এতে পরে হিসেবে সুবিধা হবে।

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, বহিষ্কার, এই মুহূর্তে বহিষ্কার।

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে বলছেন?

'হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। বহিষ্কার, বহিষ্কার।'

'আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে চাচ্ছি দুলাভাই যে আপনার আচার আচরণ পরিষ্কার ইংগিত করছে--'

'আবার কথা বলে, বহিষ্কার।'

ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে, বেশ খারাপ। অবশ্যি তার মন খারাপ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আজো হল না। নিজের ঘরে ঢোকা মাত্র মন ভাল হয়ে গেল। রাত কাটানোর খুব ভাল ব্যবস্থা করা আছে। ভিডিও ক্লাব থেকে স্পার্টাকার্স ছবিটা আবার আনা হয়েছে, এবারের প্রিন্ট বেশ ভাল। আজ রাতে ছবি দেখা হবে। ছবি দেখার ফাঁকে ফাঁকে ডিসকাশন হবে কাদেরের সঙ্গে। ছবির খুঁটি নাটি কাদের এত ভাল বোঝে যে ফরিদ প্রায়ই চমৎকৃত হয়। যেমন স্পাটাকার্স ছবির এক অংশ স্পটাকার্সের সঙ্গে নিগ্রো গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের আগের মুহূর্তে দু'জন একটা ঘরে অপেক্ষা করছে। উত্তেজনায় স্পার্টাকার্স কেমন যেন করছে। তার অস্থিরতা দেখে নিগ্রো হেসে ফেলল। অসাধারণ অংশ। ফরিদ বলল, দৃশ্যটা কেমন কাদের? কাদের বলল, বড়ই চমৎকার মামা কিন্তুক বিষয় আছে।

'কি বিষয়?'

'হাসিটা কম হইছে। আরেকটু বেশী হওনের দরকার।'

'উহুঁ, বেশী হলে নান্দনিক দিক ক্ষুন্ন হবে।'

'কিন্তুক মামা, হাসি যেমন হঠাৎ আইছে তেমন হঠাৎ গেলে ভাল হইত। এই হাসি হঠাৎ যায় না, ঠোঁটের মইদ্যে লাইগ্যা থাকে।'

ফরিদ সত্যি সত্যি চমৎকৃত হল। এ রকম প্রতিভা, বাজার করে আর ঘর ঝাঁট দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই খারাপ লাগে।

'মামা কি করছ?'

'কিছু করছি নারে মিলি। আয়।'

মিলি ঘরে ঢুকল। হাসি মুখে বলল, তোমাদের ছবি এখনো শুরু হয় নি?

'না।'

'আজ কি ছবি?'

'স্পার্টাকাস।'

'স্পার্টাকাস না একবার দেখলে।'

'একবার কেন হবে, এ পর্যন্ত পাঁচবার হল। ভাল জিনিস অনেকবার দেখা যায়।'

'আচ্ছা মামা এই যে তুমি কিছুই কর না, খাও দাও ঘুমাও ছবি দেখ, তোমার খারাপ লাগে না?'

'না তো। খারাপ লাগবে কেন? তুই যদি পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করিস তাহলে জানতে পারবি পৃথিবীর জনগুষ্ঠির একটা বড় অংশ এইভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়। জনগুষ্ঠির ইকুইলিব্রিয়াম বজায় রাখার জন্যেই এটা দরকার। জনতার এই অকর্মক অংশের কাজ হচ্ছে– কর্মক অংশগুলির টেনশন 'এ্যাবজর্ভ' করা। অর্থাৎ শক এ্যাবজর্ভারের মত কাজ করা।'

'সব ব্যাপারেই তোমার একটা থিওরী আছে, তাই না মামা?'

'থিওরী বলা ঠিক হবে না, বলতে পারিস হাইপোথিসিস। 'থিওরী আর হাইপোথিসিস কিন্তু এক না–'

'চুপ করতো মামা।'

'তুইও দেখি তোর বাবার মত হয়ে যাচ্ছিস। সব কিছুতে–চুপ কর, চুপ কর।'

মিলি গম্ভীর গলায় বলল, আজ তোমার থিওরী শুনতে আসিনি মামা। আজ এসেছি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

'আমি কি করলাম?'

'তুমি খুব অন্যায় করেছ মামা।'

'অন্যায় করেছি?'

'হ্যাঁ করেছ। বাবার স্বভাব চরিত্র তুমি খুব ভাল করেই জান। তুমি জান বেচারা কত অল্পতে আপসেট হয়। সব জেনেশুনে তুমি তাকে আপসেট কর। মাছের সমস্যাটা নিয়ে বাবা এতদিন ধরে ভাবছে, হতে পারে তার ভাবনাটা ঠিক না। কিন্তু কেউ যেখানে ভাবছে না বাবাতো সেখানে ভাবছে।'

'তা ভাবছে।'

'তাকে আমরা সাহায্য না করতে পারি–ডিসকারেজ করব কেন?'

'এইসব উদ্ভট আইডিয়াকে তুই সাপোর্ট করতে বলছিস?'

'হ্যাঁ বলছি। এতে বাবা শান্তি পাবে, সে বুঝবে যে সে একা না।'

'তুই এমন চমৎকার করে কথা বলা কোত্থেকে শিখলি?'

'সিনেমা দেখে দেখে শিখিনি–এইটুকু বলতে পারি।'

'তোর কথা বলার ধরণ দেখে অবাকই হচ্ছি–ছোটবেলায় তো হাবলার মত ছিলি।'

'কি যে তোমার কথা মামা। আমি আবার কবে হাবলার মত ছিলাম?'

মিলি উঠে দাঁড়াল। ফরিদ বলল, আচ্ছা যা তোর কথা রাখলাম। ষ্ট্রং সাপোর্ট দেব।

মিলি বলল, সবকিছুতেই তুমি বাড়াবাড়ি কর মামা, ষ্ট্রং সাপোর্টের দরকার নেই।

'তুই দেখ না কি করি।'

মিলি চিন্তায় পড়ে গেল। মামার কাজ কর্মের কোন ঠিক–ঠিকানা নেই। কি করে বসবে কে জানে। মামাকে কিছু না বলাই বোধ হয় ভাল ছিল। মিলি নিজের ঘরে চলে গেল। মনটা কেন জানি খারাপ লাগছে। মন খারাপ লাগার যদিও কোন কারণ নেই। ইদানিং এই ব্যাপারটা ঘন ঘন ঘটছে। অকারণে মন খারাপ হচ্ছে।

'আফা ঘুমাইছেন?'

মিলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রহিমার মা দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার রহিমার মা?'

'একটা সমিস্যা হইছে আফা।'

'কি সমস্যা।'

'চশমা দেওনের পর থাইক্যা সব জিনিস দুইটা করে দেখি।'

'বল কি?'

'হ আফা। এই যে আফনে চেয়ারে বইয়া আছেন মনে হইতাছে দুইখান আফা। একজন ডাইনের আফা একজন বাঁয়ের আফা।

মিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রহিমার মা বলল, টেবিলের উফরে একখান গেলাস থাকে তখন আমি দেখি দুইখান গেলাস, এই দুই গেলাসের মাঝামাঝি হাত দিলে আসল গেলাস পাওয়া যায়।

'কি সর্বনাশের কথা। চশমা পরা বাদ দাও না কেন?'

'অত দাম দিয়া একখান জিনিস কিনছি বাদ দিমু ক্যান? সমিস্যা একটু হইতাছে, তা কি আর করা কন আফা, সমিস্যা ছাড়া এই দুনিয়ায় কোন জিনিস আছে? সব ভাল জিনিসের

মইদ্যে আল্লাহতালা মন্দ জিনিস ঢুকাইয়া দিছে। এইটা হইল আল্লাহতালার খুদরত। যাই আফা।'

রহিমার মা চলে যাচ্ছে। পা ফেলছে খুব সাবধানে, কারণ সে শুধু যে প্রতিটি জিনিস দু'টা করে দেখছে তাই না ঘরের মেঝেও উঁচু নিচু দেখছে। তার কাছে মনে হচ্ছে চারদিকে অসংখ্য গর্ত। এইসব গর্ত বাঁচিয়ে তাকে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। চশমা পরা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

মিলির পড়ায় মন বসছে না। সে বাতি নিভিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। উপর থেকে টগর এবং নিশার খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছে। এত রাতেও বাচ্চা দু'টি জেগে আছে। এদের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোনদিন সন্ধ্যা না মিলতেই ঘুমিয়ে পড়ে আবার কোনদিন গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। আনিস সাহেব বাচ্চা দু'টিকে ঠিকমত মানুষ করতে পারছেন না। সারাদিন কোথায় কোথায় নিয়ে ঘুরেন। আগের স্কুল অনেক দূরে কাজেই তারা এখন স্কুলেও যাচ্ছে না। ভদ্রলোকের উচিত আশেপাশের কোন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া। তিনি তাও করছেন না।

বাচ্চাদের হাসির সঙ্গে সঙ্গে এবার তাদের বাবার হাসিও শোনা গেল। কি নিয়ে তাদের হাসাহাসি হচ্ছে জানতে ইচ্ছা করছে–নিশ্চয়ই কোন তুচ্ছ ব্যাপার। এমন নির্মল হাসি সাধারণত তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়েই হয়।

মিলির ধারণা সত্যি। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েই হাসাহাসি হচ্ছে। আনিস তার ছেলেবেলার গল্প করছে, তাই শুনে একেকজন হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আনিসের ছেলেবেলা সিরিজের প্রতিটি গল্পই এদের শোনা, তবু কোন এক বিচিত্র কারণে গল্পগুলি এদের কাছে পুরানো হচ্ছে না।

নিশা বলল, তুমি খুবই দুষ্টু ছিলে তাই না বাবা?

'না দুষ্ট ছিলাম না। আমার বয়েসী ছেলেদের মধ্যে আমি ছিলাম সবচে শান্ত। তবু কেন জানি সবাই আমাকে খুব দুষ্ট ভাবত।'

'বাবা আমরা কি দুষ্ট না শান্ত?'

'তোমরা খুবই দুষ্ট কিন্তু তোমাদের সবাই ভাবে শান্ত। অনেক রাত হয়ে পড়েছে এসো শুয়ে পড়ি।'

টগর বলল, আজ ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না।

'কি করতে ইচ্ছা করছে?'

'গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে। তোমাদের বিয়ের গল্পটা কর না বাবা।'

'এই গল্পতো অনেকবার শুনেছ, আবার কেন?'

'আরেকবার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'এই গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুতে যাবে তো?'

'হ্যাঁ যাব।'

'তোমার মা ছিল খুব চমৎকার একটি মেয়ে–'

নিশা বাবার কথা শেষ হবার আগেই বলল, আর ছিল খুব সুন্দর।

'হ্যাঁ খুব সুন্দরও ছিল। তখনো আমি তাকে চিনি না। একদিন নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে বই কিনতে গিয়েছি, একই দোকানে তোমার মাও–গিয়েছে–'

টগর বলল, মার পরণে আসমানী রঙের একটা শাড়ি।

'হ্যাঁ তার পরণে আসমানী রঙের শাড়ি ছিল।'

নিশা বলল, সে বই কিনতে গিয়েছে কিন্তু বাসা থেকে টাকা নিয়ে যায় নি।

আনিস হেসে ফেলল।

নিশা বলল, হাসছ কেন বাবা?

'তোমরা দু'জনে মিলেইতো গল্পটা বলে ফেলছ, এই জন্যেই হাসি আসছে। চল আজ শুয়ে পড়া যাক। ঠান্ডা লাগছে।'

তারা আপত্তি করল না। বিছানায় নিয়ে শোয়ানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকদিন পর আনিস তার খাতা নিয়ে বসল। উপন্যাসটা যদি শেষ করা যায়। নিতান্তই সহজ সরল ভালবাসাবাসির গল্প। অনেকদূর লেখা হয়ে আছে কিন্তু আর এগুনো যাচ্ছে না। একেই বোধ হয় বলে রাইটার্স ব্লক, লেখক চরিত্র নিয়ে ভাবতে পারেন, মনে মনে কাহিনী অনেকদূর নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু লিখতে গেলেই কলম আটকে যায়। যেন অদৃশ্য কেউ এসে হাত চেপে ধরে, কানে কানে বলে– না তুমি লিখতে পারবে না।

আনিস রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে দু'পৃষ্ঠা লিখল। ঘুমুতে যাবার আগে সেই দু পৃষ্ঠা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল।

৮

সকাল। দশটার উপর বাজে।

খাবার টেবিলে ফরিদের নাশতা সাজানো। ফরিদ নাশতা খেতে আসছে না সে বাগানে বসে আছে। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সারারাত ঘুম হয়নি। অঘুমোজনিত ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের চাপা উত্তেজনাও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিলিকে খবর পাঠানো হয়েছে। ফরিদ অপেক্ষা করছে মিলির জন্যে। মিলি ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্যে তৈরী হয়েই নীচে নামল। মামার খোঁজে বাগানে গেল।

'কি ব্যাপার মামা?'

সারারাত ঘুম হয়নিরে মিলি।

'তাতে তো তোমার খুব অসুবিধা হবার কথা না। প্রচুর ঘুম তোমার একাউন্টে জমা আছে। বছর খানেক না ঘুমালেও কিছু হবে না।'

'তোর কি খুব তাড়া আছে?'

'হ্যাঁ আছে। এগারোটায় ক্লাস, এখন বাজে দশটা দশ।'

'আজকের ক্লাসটা না করলে হয় না?'

'না হয় না। ব্যাপারটা কি বলে ফেল।'

'অদ্ভুত একটা আইডিয়া মাথায় চলে এসেছে। অন্ধকারে যেন একটা এক হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল।'

'তাই না-কি?'

'দুলা ভাইয়ের মৎস্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম। কি করে তাঁকে সাপোর্ট করা যায় এই সব–ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছি হঠাৎ মাথার মধ্যে দপ করে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল। আমি ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠলাম।'

'আইডিয়া পেয়ে গেলে?'

'রাইট। আইডিয়া পেয়ে গেলাম, ছবি বানাব।'

'ছবি বানাবে মানে?'

'দেশের মৎস্য সম্পদ নিয়ে একটা শর্ট ফ্লিম। মাছের জীবন কথা বলতে পারিস। মাছদের জীবনের আনন্দ–বেদনার কাব্য। ছবির নামও ঠিক করে ফেললাম। ছবির নাম–হে মাছ।'

'হে মাছ?'

'হ্যাঁ–হে মাছ। এই ছবি যখন রিলিজ হবে তখন চারদিকে হৈ চৈ পরে যাবে। মৎস্য সমস্যার 'এ টু জেড' পাবলিক জেনে যাবে। দুলাভাই যা চাচ্ছিলেন তাই হবে তবে অনেক তাড়াতাড়ি হবে। এক গুলিতে যুদ্ধ জয় যাকে বলে।'

'ছবি যে বানাবে টাকা পাবে কোথায়?'

'কোন মহৎ কাজ কখনো টাকার অভাবে আটকে থাকে বল?'

'মামা যাই, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'একদিন ইউনিভার্সিটিতে না গেলে কি হয়?'

'অনেক কিছু হয়। তুমি তোমার চিন্তা ভাবনা করতে থাক পরে শুনব।'

ফরিদ সারা দুপুর দরজা বন্ধ করে বসে রইল। কাদেরের কাজ হল কিছুক্ষণ পর পর চা এনে দেয়া। ফরিদ কোথায় যেন পড়েছিল তামাকের নিকোটিন ক্রিয়েটিভিটিতে সাহায্য করে। কাদেরকে দিয়ে সিগারেট আনানো হল। সিগারেটের ধূয়া মাথা ঘুরা, বমি ভাব এবং কাশি তৈরী ছাড়া অন্যকোন ভাবে সাহায্য করল না। দুপুরে ফরিদ কিছু খেল না–শুধু একটা টোস্ট বিসকিট এবং আধ কাপ দুধ। কারণ ফুল ষ্টমাকে ক্রিয়েটিভ কাজ কিছু হয় না। জগতে বড় বড় ক্রিয়েটিভ কাজ করছে প্রতিভাবান ক্ষুধার্ত মানুষ। ক্ষুধার সঙ্গে প্রতিভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

সন্ধ্যা নাগাদ 'হে মাছ' চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরী হয়ে গেল। প্রথম পাঠক সৈয়দ মোহাম্মদ কাদের। ফরিদ বলল, কেমন বুঝছিস কাদের?

কাদের গাড় স্বরে বলল, 'বোঝাবুঝির কিছু নাই মামা–ফাডাফাডি জিনিস হইছে।'

'ক্লাইমেক্সগুলি কেমন এসেছে?'

'কেলাইমেক্সের কথা কইয়া আর কাম কি মামা? ফলে পরিচয়। এই দেহেন শইলের লোম খাড়া হইয়া গেছে। হাত দিয়ে দেহেন।'

ফরিদ হাত দিয়ে দেখল– যে কোন কারণেই হোক কাদেরের গায়ের লোম সত্যি সত্যি খাড়া হয়ে আছে।

'কাদের!'

'জ্বি মামা।'

'এখনো ফাইন্যাল করিনি তবে মনে হচ্ছে তোকে একটা রোল দেব।'

'কি কইলেন মামা?'

'নৌকার হতদরিদ্র মাঝির ভূমিকা তোর পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

কাদের স্তম্ভিত। সে মূর্তির মত বসে রইল। নড়াচড়া করতে পারল না।

সোবাহান সাহেবের শরীর আজ বেশ ভাল। জ্বর নেই। ক্লান্তির ভাব ছাড়া তার কোন শারিরীক অসুবিধাও নেই। তিনি যথারীতি বারান্দায় তাঁর ইজিচেয়ারে বসে আছেন। তার কোলে বিশাল খাতা যার মলাটে লেখা মৎস্য সমস্যা। আজ আবার মৎস্য সমস্যা নিয়ে বসেছেন। বাংলাদেশের মাছের পূর্ণ তালিকা এখনো তৈরী হয়নি। ছোট প্রজাতির মাছগুলির একেক অঞ্চলে একেক নাম। এও এক যন্ত্রণা!

রহিমার মা সোবাহান সাহেবের সামনে বসে আছে। মাছের নাম বলছে। বেশ কিছু নাম সোবাহান সাহেব তার কাছ থেকে পেয়েছেন।

'কি নাম বললে?'

'দাড়কিনি মাছ।'

'দাড়কিনি মাছ? সত্যি সত্যি এই নামে কোন মাছ আছে না বসে বসে বানাচ্ছ? দাঁড়কাকের কথা জানি। দাড়কিনিতো কখনো শুনিনি।'

'আছে, আফনে লেহেন–পিতল্ল্যা মাছ।'

'পিতল্ল্যা মাছ?'

'জ্বি।'

'সেটা কেমন?'

'খুব ছোড, লেজ আছে।'

'ফাজলামী করছ না–কি রহিমার মা? লেজ তো সব মাছেরই আছে। এমন কোন মাছ আছে যার লেজ নেই?'

'থাকতেও পারে। আল্লাহর খুদরতেরতো কোনো সীমা নাই।'

'আচ্ছা তুমি এখন যাও।'

নামডা লেখছেনতো–পিতল্ল্যা মাছ। পিতলের লাহান রং এই কারণে নাম পিতল্ল্যা মাছ।'

সোবাহান সাহেব পিতল্ল্যা মাছ লিখলেন তবে ব্র্যাকেটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রাখলেন।

আনিসকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল। তার সঙ্গে টগর এবং নিশা। আনিস হাসি মুখে বলল, স্লামালিকুম স্যার।

টগর এবং নিশাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, স্লামালিকুম স্যার, স্লামালিকুম স্যার।

'যাচ্ছ কোথায় আনিস?'

'কোথাও না। ওদের নিয়ে একটু হাঁটতে বের হয়েছি। আপনি কি করছেন?'

'আমি মাছের নাম লিখছি। তোমাকে বলেছিলাম না মৎস্য সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি। আমাদের দেশ হচ্ছে মাছের দেশ অথচ মাছের কি ভয়াবহ আকাল।'

'তাতো বটেই।'

'দু'টা মিনিট দাঁড়াওতো আনিস–আমি নামগুলি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। দেখ কোন নাম বাদ পড়েছে কিনা।'

সোবাহান সাহেব পড়তে শুরু করলেন–রুই, কাতল, মৃগেল, পাঙ্গাশ, চিতল, বোয়াল, কালি বাউস, নানিদ, চিংড়ি, কৈ, মাগুর, শিং, পুটি, শোল, মহাশোল, রিঠা, ভেটকি, টেংরা, খইলসা, কাঁইক্যা, পাবদা, লাটি, বাতাসী, আইড়, বাইম, তপশে, নলা, ফইল্যা, দাড়কিনি, পিতল্ল্যা–কিছু কি বাদ পড়ল আনিস?

আনিস কিছু বলার আগেই নিশা বলল–ইলিশ বাদ পড়েছে স্যার। সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সত্যি সত্যি 'ইলিশ' বাদ পড়েছে। এটা কি করে হল? আসল মাছটাই বাদ পড়ে গেল। সোবাহান সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, এটা কেমন করে হল আনিস? এত বড় ভুল কি করে করলাম?

আনিস হাসিমুখে বলল, এটা কোন বড় ভুল না, খুবই সাধারণ ভুল–যা আমরা সব সময় করি। যে জিনিস চোখের সামনে থাকে তাকে আমরা ভুলে যাই। যে ভালবাসা সব সময় আমাদের ঘিরে রাখে তার কথা আমাদের মনে থাকে না। মনে থাকে হঠাৎ আসা ভালবাসার কথা।

'ঠিকই বলেছ আনিস।'

'স্যার যাই স্লামালিকুম।'

তিনি জবাব দিলেন না। টগর বলল, স্যার যাই স্লামালিকুম। নিশাও বলল, স্যার যাই স্লামালিকুম। সোবাহান সাহেব হেসে ফেললেন। হঠাৎ তার কাছে মনে হল এই পৃথিবী বড়ই

আনন্দের স্থান। এই পৃথিবীতে বাস করতে পারার সৌভাগ্যের জন্যে তিনি নিজের প্রতিই খানিক ঈর্ষা অনুভব করতে লাগলেন।

খাবার টেবিলে 'হে মাছে'র চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। খেতে বসেছে মিলি এবং ফরিদ। মিলির চিত্রনাট্য বিষয়ক কথা বার্তা শোনার আগ্রহ নেই, কিন্তু ফরিদ শোনাবেই। ফরিদ গম্ভীর গলায় বলছে–

'সব মিলিয়ে চরিত্র হচ্ছে চারটি। জেলে, জেলের স্ত্রী, খেয়া নৌকার মাঝি এবং একটা চোর।'

মিলি বলল, মাছ নিয়ে ছবি এর মধ্যে আবার চোর কেন?

'পুরোটা না শুনেই কথা বলিস এটাই হচ্ছে তোর বড় সমস্যা। চোরের প্রয়োজন আছে বলেই চোর আছে। একটা হাই ড্রামা ষ্টোরী। এখানে টেনশান বিল্ড আপ করতে চোর লাগবে। জেলের নিজস্ব কোন নৌকা নেই, সে খেয়া নৌকায় করে মাছ মারতে বের হয়েছে। সেই নৌকায় বসে আছে একজন চোর। ওপেনিং শটে – নৌকা দেখা যাচ্ছে। দিনের অবস্থা ভাল না। ঢেউ উঠেছে। নৌকা টালমাটাল করছে। ফার্ষ্ট ডায়লগ জেলে দিচ্ছে– ক্যামেরা জুম করে জেলের মুখে চলে গেল, মিলি শুনছিসতো কি বলছি?'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'জেলে বলল, ও মাঝি বাই, একখান গীত গান। মাঝি বলল, পেডে যদি ভাত না থাহে, গীত আইব ক্যামনে। জেলে বলল, কথা সত্য। নদীত নাই মাছ। তখন হঠাৎ কি মনে করে যেন মাঝি গান ধরল, ও আমার সোনা বন্ধুরে ও আমার রসিয়া বন্ধুরে। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে জাল ফেলা হবে। ক্যামেরা মাঝির মুখ থেকে কাট করে চলে যাবে জালে। সেখান থেকে কাট করে পানিতে, কাট করে লং শটে নৌকা। কাট মিড ক্লোজ আপে তোর মুখ।'

'আমার মুখ মানে?'

'জেলের স্ত্রীর ভূমিকায় তুই অভিনয় করছিস। দুঃখ, অভাব অনটনে পর্যুদস্ত বাংলার শাশত নারী। হৃদয়ে মমতার সমুদ্র, পেটে ক্ষুধার অগ্নি।'

'মামা, তোমার এইসব ঝামেলায় কিন্তু আমি নেই।'

'আমি কি বাইরে থেকে আর্টিষ্ট আনব না-কি? নিজেদেরই কাজ করতে হবে। আমি পৃথিবীকে দেখিয়ে দেব–অভিনয়ের 'অ' জানে না এমন সব মানুষ নিয়েও ছবি হয় এবং এ ক্লাস ছবি হয়। ডায়ালগ মুখস্ত করে ফেলবি, পরশু থেকে রিহার্সেল।'

মিলি বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমার এই পাগলামীর কোন মানে হয় মামা? মুখে বললেই ছবি হয়ে যাবে? টাকা পয়সা লাগবে না?'

'আমার কি টাকা পয়সার অভাব? দুলাভাইয়ের কাছে আমার কত টাকা জমা আছে তুই জানিস? প্রয়োজন হলে মগবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দেব। মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত। একবার যখন বলে ফেলেছি–'

'হবে না। শুধু শুধু–'

'আগেই টের পেয়ে গেছিস শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না? জীবন সম্পর্কে এমন পেসিমিষ্টিক ভিউ রাখবি না। মনটাকে বড় কর।'

'আর কে কে অভিনয় করছে তোমার ছবিতে?'

'এখনো ফাইন্যাল হয় নি। ডাক্তার ছোকরাকে বলে দেখব, আর দেখি নতুন ভাড়াটে আনিস রাজি হয় কি-না।'

'ওরা ছবিতে অভিনয় করবে কেন?'

'শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ থেকে করবে। মহৎ কাজে শরিক হবার স্পিরিট থেকে করবে। আনিস ছোকরাকে আজ রাতেই ধরব।'

মিলি তাকিয়ে আছে মামার দিকে। সে যে খুব উৎসাহ বোধ করছে তা মনে হচ্ছে না।

'আনিস আছ না-কি?'

আনিস দরজা খুলল। ফরিদকে দেখে অবাক হলেও ভাব ভঙ্গিতে তার কোন প্রকাশ হল না। সে হাসি মুখে বলল, স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি করে বললাম। কিছু মনে করনিতো? আমি মিলির মামা।'

'জ্বি আমি জানি। আসুন ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে যাব না। কাজের কথা সেরে চলে যাব। খুব ব্যস্ত। ছবির স্ক্রীপ্ট করছি, মাছ নিয়ে শর্ট ফ্লিম বানাচ্ছি। নাম হচ্ছে-'হে মাছ।'

'তাই না কি?'

'হ্যাঁ! তাই। এখন কথা হচ্ছে তুমি কি ছবিতে অভিনয় করবে? এক গাদা কথা বলার দরকার নেই। বল হ্যাঁ কিংবা না।'

আনিস হকচকিয়ে গেল। কেউ তাকে অভিনয়ের জন্যে ডাকতে পারে তা তার মাথায় কখনো আসে নি। ফরিদ বলল, আমার ছবিতে একটা চোরের ক্যারেক্টার আছে। এই জন্যেই তোমার কাছে আসা নয়ত আসতাম না। তোমার চেহারায় একটা চোর চোর ভাব আছে।

আনিস হতভম্ব হয়ে বলল, আমার চেহারায় চোর চোর ভাব আছে?

'হ্যাঁ আছে।'

আনিস বিস্মিত গলায় বলল, 'নিজের সম্পর্কে আজে বাজে কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আমার চেহারা চোরের মত এটা এই প্রথম শুনলাম।'

'সত্যি কথা আমি পেটে রাখতে পারি না। বলে ফেলি। তুমি আবার কিছু মনে করনি তো?'

'জ্বি না, কিছু মনে করিনি।'

'অভিনয় করবে না-করবে না?'

'করব। এ জীবনে অনেক কিছুই করেছি। অভিনয়টাই বা বাদ থাকবে কেন?'

ফরিদ হৃষ্ট চিত্তে নীচে নেমে এল। এখন ডাক্তার ছোকরা রাজী হলেই কাজ শুরু করা যায়। তবে ছোকরার ব্রেইন বলে কিছু নেই। তার কাছ থেকে অভিনয় আদায় করা কষ্ট হবে। ব্যাটা হয়তো রাজিও হতে চাইবে না। ফরিদের ধারণা ডাক্তার এবং ইনজিনীয়ার এই দুই সম্প্রদায়, অভিনয় কলার প্রতি খুব উৎসাহী নয়। আজ রাতেই ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেললে কেমন হয়?

ফরিদ কাদেরকে পাঠাল মনসুরকে ডেকে আনতে। মনসুর সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। মনে হল যেন কাপড় পরে এ বাড়িতে আসার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। মনসুরের সঙ্গে ফরিদের নিম্নলিখিত কথোপকথন হল।

ফরিদঃ তোমাকে একটি বিশেষ কারণে ডেকেছি। অসুখ বিসুখের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

মনসুর ঃ জ্বি বলুন।

ফরিদঃ আচ্ছা স্ত্রী হিসাবে মিলি কি তোমার জন্যে মানানসই হবে বলে মনে হয়? মিলি আবার একটু বেঁটে, ভেবে চিন্তে বল।

মনসুরঃ (তোতলাতে তোতলাতে) জ্বি মামা, অবশ্যই হবে। বেঁটে কি বলছেন? পারফেক্ট হাইট। মানে আমার ধারণা— মানে—

ফরিদঃ মিলির স্বামী হিসেবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে?

মনসুরঃ অবশ্যই পারব। একশ বার পারব।

ফরিদঃ তাহলে কাল থেকে রিহার্সেল শুরু করে দাও।

মনসুরঃ (বিস্মিত) কিসের রিহার্সেল?

ফরিদঃ মিলি করবে জেলের স্ত্রীর ভূমিকা আর তুমি হচ্ছ জেলে।

মনসুরঃ আমি মামা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফরিদঃ ছবি বানাচ্ছি। শর্ট ফ্লিম। সেখানে তোমার ভূমিকা হচ্ছে অভাব অনটনে পর্যুদস্ত জেলে, আর মিলি তোমার স্ত্রী।

মনসুরঃ ছবির কথা বলছেন?

ফরিদঃ অফকোর্স ছবির কথা বলছি। তুমি কি ভেবেছিলে?

মনসুরঃ (শুকনো গলায়) একগ্লাস ঠান্ডা পানি খাব।

একগ্লাস ঠান্ডা পানি খেয়ে মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, মিস মিলি কি আমার সঙ্গে অভিনয় করতে রাজী হবেন?

'সেতো রাজী হয়েই আছে।'

'তাই নাকি—আরেক গ্লাস পানি খাব।'

মনসুর দ্বিতীয় গ্লাস পানি খেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জানাল যে সে অতি আগ্রহের সঙ্গে মিস মিলির সঙ্গে অভিনয় করবে।

'তুমি আগে অভিনয় করেছ?'

'জ্বি না।'

'অসুবিধা হবে না—আমি শিখিয়ে দেব। অভিনয় কঠিন কিছু না। জাল ফেলতে জান?'

'জ্বি না।'

'শিখে নেবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মাথাটা কাল পরশু কামিয়ে ফেল।'

ডাক্তার হকচকিয়ে গেল। ঢোঁক গিলে ভয়ে ভয়ে বলল, কি বললেন মামা?

'মাথাটা কামিয়ে ফেলতে বললাম। জেলেদের মাথায় থাকে কদমছাট চুল। মাথা না কামালে ঐ জিনিস পাব কোথায়? কোন অসুবিধা আছে?'

'জ্বি না। কোন অসুবিধা নেই। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

'ভেরি গুড।'

'অভিনয় নিয়ে মিস মিলির সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?'

ফরিদ বিরক্ত হয়ে বলল, তার সঙ্গে আবার কি কথা? সে অভিনয়ের জানে কি? যা জানতে চাইবে আমাকে প্রশ্ন করলেই জানবে।'

ডাক্তার বলল, জ্বি আচ্ছা।

৯

ফজরের নামাজ শেষ করে সোবাহান সাহেব তসবি হাতে বাগানে খানিকক্ষণ হাঁটেন। আজও তাই করছেন। হঠাৎ মনে হল কে যেন গেটে টোকা দিচ্ছে। এত ভোরে কে আসবে এ বাড়িতে? তিনি বিস্মিত হয়ে গেট খুললেন–বিলু দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা বিশ্বাসই হল না। বিলুর মেডিকেল কলেজ খোলা। ক'দিন পরই পরীক্ষা। এই সময় সে ঢাকায় আসবে কেন? আনন্দ ও বিস্ময়ে সোবাহান সাহেব অভিভূত হয়ে গেলেন।

'আরে তুই? বিলু মা, তুই?'

বিলু বেবীটেক্সী ভাড়া মেটাতে মেটাতে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। ভোরবেলার আলোয় হলুদ রঙের শাল জড়ানো বিলুকে অপ্সরীর মত লাগছে। তার এই মেয়ে বড় সুন্দর। স্বর্গের সব রূপ নিয়ে এই মেয়ে পৃথিবীতে চলে এসেছে।

ভাড়া মিটিয়ে রাস্তার উপরই বিলু নীচু হয়ে বাবার পা স্পর্শ করল। নরম গলায় বলল, তুমি এতো রোগা হয়েছ কেন বাবা? সোবাহান সাহেবের চোখে পানি এসে গেল। তাঁর বড় মেয়ের সামান্য কথাতেই তাঁর চোখ ভিজে উঠে। তিনি ধরা গলায় বললেন,

'কলেজ ছুটি না–কি মা?'

'ছুটি না–ছাত্ররা মারামারি করে সব বন্ধ টন্ধ করে দিয়েছে। একমাত্র আমাদের মেডিকেল কলেজটাই খোলা ছিল। ঐটাও বন্ধ হল।'

'একা এসেছিস?'

'না! সব মেয়েরা একসঙ্গে এসেছি। সন্ধ্যাবেলা লঞ্চে উঠলাম, ঢাকা পৌঁছলাম রাত তিনটায়। একটু সকাল হতেই চলে এসেছি।'

'ভাল করেছিস মা। খুব ভাল করেছিস।'

সোবাহান সাহেবের ইচ্ছা করছে চেঁচিয়ে বাড়ির সবার ঘুম ভাঙ্গাতে, তিনি তা করলেন না। নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। বড় মেয়ের সঙ্গে কিছু সময় একা একা থাকার আনন্দওতো কম নয়।

দুজন চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে। বিলু এক হাতে বাবাকে জড়িয়ে রেখেছে। তার এত ভাল লাগছে।

'বাসার খবর বল বাবা।'

'কোন খবরটা শুনতে চাস?'

'মামা নাকি ছবি বানাচ্ছে? মিলি চিঠি লিখেছিল।'

সোবাহান সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, গাধাটা বড় যন্ত্রণা করছে। রিহার্সেল টিহার্সেল কি কি করছে। বিকেলে বাসায় থাকা মুশকিল।'

বিলু আপন মনে হাসল। ফরিদ তার খুবই পছন্দের মানুষ। বিলু হালকা গলায় বলল, মামার পাগলামী কমেনি?

'না বেড়েছে। আমার মনে হয় কিছুদিন পর তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।'

'ধরে বেঁধে মামার একটা বিয়ে দিয়ে দাও।'

'ঐ সব কথাই মনে আনবি না। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয়?'

বিলু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে লাগল। মাত্র চার মাস পরে সে ফিরেছে অথচ মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পরে ফিরল। সব কেমন যেন অচেনা।

'আরে আফা কোন সময়ে আইলেন? কি তাজ্জব!'

বিলু প্রথম দেখায় চিনতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চোখে চশমা, মুখ ভর্তি দাড়ি চেনা ভঙ্গিতে কে যেন হাসছে।

'আফা আমি কাদের।'

'তুমি দাড়ি কবে রাখলে কাদের?'

'সিনেমায় পার্ট করতাছি আফা—মামার সিনেমা, আমার হিরোর পার্ট। খেয়া নৌকার মাঝি।'

'তাই নাকি? খেয়া নৌকার মাঝির বুঝি দাড়ি থাকতে হয়?'

'ডিরেকটর সাব চাইছে।'

'বিলু হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল—তোমরা বেশ সুখে আছ বলে মনে হচ্ছে কাদের।'

'আর সুখ। সিনেমা করা কি সোজা যন্ত্রণা? চিন্তা—ভাবনা আছে না? এইটা কি পানি—ভাত যে মরিচ দিয়া এক ডলা দিলাম আর মুখের মইদ্যে ফেললাম?'

বিলু অনেক কষ্টে মুখের হাসি আটকাল। তার খুব মজা লাগছে। কাদেরের মুখও আনন্দে উজ্জ্বল। কাদেরের ধারণা এই পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ মহিলা হচ্ছে বিলু আফা। এ বাড়ির সবাই তাকে তুই করে বলে, একমাত্র বিলু আফা বলে তুমি করে। এক গ্লাস পানির দরকার হলে বিলু আফা জনে জনে হুকুম দেয় না। নিজের পানি নিজে নিয়ে আসে। একবার কাদেরের জ্বর হল। চাকর বাকরের জ্বর হলে কে আর খোঁজ করে। ঘরের এক কোনায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে হয়। কাদের তাই করেছে, শুয়ে আছে। জ্বর খুব বেশী। চারপাশের পৃথিবী কেমন হলুদ হলুদ লাগছে। আচ্ছন্নের মত অবস্থা। এমন সময় লক্ষ্য করল কে যেন তার মাথায় পানি ঢালছে। ঠান্ডা পানি। বড় আরাম লাগছে। কাদের চোখ মেলে দেখে বিলু। একমনে পানি ঢালছে এবং রহিমার মাকে কড়া গলায় বলছে, জ্বর এত বেড়েছে, তুমি লক্ষ্য করলে না এটা কেমন কথা রহিমার মা? একশ চার টেম্পারেচার। কত সময় ধরে এ রকম জ্বর কে জানে।

রহিমার মা বলল, আমারে দেন আফা। আমি পানি ঢালি।

'থাক তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। তবে তোমার উপর আজ আমি খুব রাগ করেছি।'

সেই প্রবল জ্বরের ঘোরের মধ্যে কাদের ঠিক করে ফেলল বড় আপার জন্যে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় সে জীবন দিয়ে দিবে। বড় আপার যদি কোন শত্রু থাকে—তাকে খুন করে সে ফাঁসি যাবে।

দুপুর নাগাত গত তিন মাসে এ বাড়িতে কি কি ঘটেছে বিলু জেনে গেল। কোন কোন ঘটনা তিনবার চারবার করে শুনতে হল। একবার বলল মিলি, একবার মা, একবার কাদের। প্রতিবারেই বিলু ভান করল যে সে ঘটনাটা প্রথম বারের মত শুনছে।

বিলু আসা উপলক্ষ্যে মিলি ইউনিভার্সিটিতে গেল না। সারাক্ষণ বড় আপার পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগল এবং অনবরত কথা বলতে লাগল।

'টগর আর নিশার সঙ্গে তোমার এখনো দেখা হয় নি—পৃথিবীতে এরকম দুষ্ট ছেলেপুলে আছে, না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। তবে মুখের দিকে তাকালে তোমার মনে হবে এরা দেব শিশু। ভয়ানক ইন্টেলিজেন্ট। ওদের মা নেই, তোমাকে তো আগেই চিঠি লিখে জানিয়েছি।'

বিলু প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, আচ্ছা তোর ঐ ডাক্তার সাহেবের খবর কি?

মিলি হকচকিয়ে বলল, আমার ডাক্তার সাহেব মানে? আমার ডাক্তার সাহেব বলছ কেন?

'এম্নি বললাম, তোর চিঠিতে ভদ্রলোকের কথা প্রথম জানলাম তো। তুই লজ্জায় এমন লাল হয়ে যাচ্ছিস ব্যাপার কি? সত্যি করে বলতো–উনাকে কি তোর পছন্দ?'

মিলি রেগে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কি যে তুমি বল আপা। ঐ 'ছাগল' কে আমি পছন্দ করব কেন? আমার তো আর মাথা খারাপ হয় নি।

'তুই রেগে মেগে কেমন হয়ে গেছিস। এটাতো সন্দেহজনক।'

'আমি সত্যি কিন্তু রাগছি আপা।'

'ভদ্রলোককে খবর দে–না, আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'তাকে খবর দেবার কোন দরকার নেই। দিনের মধ্যে তিনবার করে আসছে। রিহার্সেল করছে। মামার সিনেমায় সেও তো আছে।'

'বাহ্ ভালতো। তোমরা দু'জন আবার নায়ক–নায়িকা না তো?'

'রাগিয়ে দিওনাতো আপা। এতদিন পর এসেছ বলে ঝগড়া করলাম না। নয়ত প্রচন্ড ঝগড়া হয়ে যেত। এর মধ্যে আবার নায়ক–নায়িকা কি?

বিলু হাসি মুখে ফরিদের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে শুধু মামার সঙ্গে কথা হয় নি।

ফরিদ মাথা নীচু করে কি যেন লিখছে। বিলুকে এক নজর দেখেও সে লিখেই যেতে লাগল। যেন বিলুকে সে চেনে না।

'আসব মামা?'

'না।'

'না বললেতো হবে না। এতদিন পর এসেছি তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাও বলব না?'

'না। কাজ করছি। আগামীকাল 'হে মাছ' ছবির অন দ্যা স্পট রিহার্সেল। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। লাষ্ট মিনিট চেঞ্জ যা করার এখনি করতে হবে।'

'তাই বলে তোমাকে আমি সালামও করতে পারব না?'

বিলু এগিয়ে এসে ফরিদের পা ছুঁয়ে সালাম করল। ফরিদ বলল, তুই এত ভাল মেয়ে কি করে হলি রে বিলু? ছোট বেলায় তো এত ভাল ছিলি না। যতই দিন যাচ্ছে ততই ভাল হচ্ছিস।'

'শুনে খুশী হলাম মামা।'

'খুব খুশী হবার কোন কারণ নেই। বুদ্ধি কম মানুষরাই সাধারণত ভাল হয়। আমার ধারণা যত দিন যাচ্ছে তোর বুদ্ধি তত কমে যাচ্ছে।'

বিলু খিল খিল করে হেসে উঠল। এমন গাঢ় আনন্দে অনেক দিন সে হাসে নি। এই মানুষটাকে তার বড় ভাল লাগে।

সোবাহান সাহেব তাঁর মনের মত একটা প্রবন্ধ পেয়েছেন। প্রবন্ধের নাম 'থাইল্যান্ডে মাগুর মাছের চাষ'। এই মাছের চাষে বিশাল পুকুর কাটার দরকার নেই–ট্যাংক বা চৌবাচ্চা জাতীয় জলাধার থাকলেই হল। মাছের খাবারের জন্যেও আলাদা ভাবে কিছু ভাবতে হবে না। সঙ্গে হাঁস মুরগীর চাষ করতে হবে। মাছের খাবার হবে – – – সোবাহান সাহেব থমকে গেলেন। মাছের খাবার হিসেবে যে সব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না।

'স্লামালিকুম স্যার।'

সোবাহান সাহেব পত্রিকা থেকে মুখ তুলে দেখলেন, আনিস দাঁড়িয়ে আছে। বিব্রত মুখ ভঙ্গি।

'কিছু বলবে?'

'জ্বি।'

'বল।'

'এই মাসের বাড়ি ভাড়াটা স্যার দিতে পারছি না।'

'বাড়ি ভাড়া কি তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'তাহলে বিরক্ত করছ কেন? পড়ার মাঝখানে একবার বাধা পড়লে কনসানট্রেসন কেটে যায়।'

'সরি স্যার। কি পড়ছেন?'

'থাইল্যান্ডের মাগুর চাষ।'

'আপনি তাহলে মাছের ব্যাপারটা নিয়ে সত্যি সত্যি খুব ভাবছেন।'

'হ্যাঁ ভাবছি।'

'আপনি বাংলাদেশ মাছে মাছে ছয়লাপ করে দিতে চান তাই না স্যার?'

'হ্যাঁ চাই।'

'এখন আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি একটা মজার কথা বলতে চাই– শায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলাদেশ খুব সস্তা গন্ডার দেশ ছিল। প্রচুর খাদ্য ছিল, মাছ মাংস ছিল। মূল্য ছিল নাম মাত্র। অথচ তখনো এ দেশে প্রচুর লোক ছিল অনাহারে। নাম মাত্র মূল্যেও খাদ্য কেনার মত অর্থ তাদের ছিল না। যদি আপনিও সত্যি সত্যি এই দেশ একদিন মাছে মাছে ছয়লাপ করে দেন তাতেও লাভ হবে না। যারা এখন মাছ খেতে পারছে না তারা তখনো খেতে পারবে না। তাদের টাকা নেই। মূল সমস্যাটা অন্য জায়গায়।'

'কোথায়?'

'আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ আমার একটু কাজ আছে। হে–মাছ ছবির অন লোকেসন রিহার্সেল হবে। আপনি হয়ত জানেন না ঐ ছবিতে আমার একটা রোল আছে। স্যার যাই স্লামালিকুম।'

আনিস চলে গেল। দীর্ঘ সময় সোবাহান সাহেব মূর্তির মত রইলেন। তাঁর মন আনিসের কথায় সায় দিচ্ছে। তিনি আসল সমস্যা ধরতে পারেন নি। নকল সমস্যা নিয়ে মাতামাতি করছেন। দেশের লোক যদি খেতেই না পারে তাহলে কি হবে মাছের চাষ বাড়িয়ে?

হে মাছ ছবির অন লোকেসন রিহার্সেল শুরু হয়েছে। জায়গাটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গার পার। বেশ নিরিবিলি। সঙ্গে ক্যামেরা নেই বলে লোকজন জড়ো হয়নি।

ফরিদের মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপীর মত সাদা একটা টুপী। সত্যজিৎ রায় না–কি এরকম একটা টুপী পরে স্যুটিং করেন। ফরিদের হাতে কালো একটা চোঙ। এই চোঙের মাধ্যমে নৌকায় বসা ডাক্তার এবং কাদেরের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। ডাঙায় আছে মিলি, বিলু এবং আনিস। আনিসের বাচ্চা দুটিও আছে। এরা মনের আনন্দে ছুটাছুটি করছে।

নৌকায় ডাক্তারকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। তার হাতে একটা জাল। গোল করে জাল ফেলার প্র্যাকটিস সে ভালই করেছে। জাল এখন সে ফেলতে পারে। তবে নৌকা দুলছে, দুলুনির মধ্যে

জাল ঠিকমত ফেলতে পারবে কিনা এই নিয়ে সে চিন্তিত। ডাক্তারের পরনে জেলের পোষাক তবে চুল এখনো ছাটা হয়নি। কাদের বৈঠা নিয়ে বসে আছে। তাকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। ফরিদের নির্দেশে তারা নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকা মাঝ নদীতে যাবার পর অভিনয় হবে। ডাক্তার ভীত গলায় বলল, কাদের ভয় লাগছে।

কাদের বলল ভয়ের কি আছে ডাক্তার সাব? উপরে আল্লাহ নীচে মাডি।

'মাটি কোথায়? নীচে তো পানি।'

'একই হইল। আল্লাহর কাছে মাডি যা, পানিও তা। আল্লাহর চোউখ্যে সব সমান।'

'সাঁতার জানি না যে কাদের।'

'সাঁতার আমিও জানি না ডাক্তার সাব। মরণতো একদিন হইবই। অত চিন্তা করলে চলবে না। পানিতে ডুইব্যা মরার মজা আছে।'

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, মরার মধ্যে আবার কি মজা?

'শহীদের দরজা পাওয়া যায়। হাদিস কোরানের কথা।'

''শহীদের দরজার আমার দরকার নেই কাদের। নৌকা এত দুলছে কেন?'

ডাঙ্গা থেকে চোঙ মারফত ফরিদের নির্দেশ ভেসে এল–ডাক্তার ষ্টার্ট করে দাও–রেডি–ওয়ান–টু–এ্যাকসান।

'এ্যাকসানে যাবার আগেই দৃশ্য কাট হয়ে গেল। ফরিদ বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল–কাট, কাট, এই হারামজাদা কাদের চশমা পরেছিস কেন? খোল চশমা।

কাদের চশমা খুলল। সে খুব শখ করে চশমা পরেছিল।

এ্যাকসান। ডাক্তার তুমি বিষন্ন চোখে আকাশের দিকে তাকাও। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল। আবার তাকাও আকাশের দিকে। গুড। কাদের তুই কানের ফাঁকে রাখা বিড়ি ধরা। গুড। পানিতে থুথু ফেল। পুরো ব্যাপারটা ন্যাচারেল হতে হবে। ডাক্তার তুমি জালকে তিনবার সালাম কর। গুড। ভাল হচ্ছে। এই বার জাল ফেল।'

ডাক্তার জাল ফেলল। আশ্চর্য কান্ড পানিতে শুধু জাল পড়ল না, জালের সঙ্গে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ডাক্তারও পড়ে গেল। জাল এবং ডাক্তার দুইই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য, ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে।

কাদের বিড় বিড় করে বলল, বিষয় কিছুই বুঝলাম না।

ফরিদ হতভম্ব।

মিলি বলল, মামা ডাক্তার তো ডুবে গেছে।

ফরিদ থমথমে গলায় বলল, 'তাইতো দেখছি। এই গাধা কি সাঁতারও জানে না? গরু গাধা নিয়ে ছবি করতে এসে দেখি বিপদে পড়লাম।'

ডাক্তারের মাথা ভুস করে ভেসে উঠল। কি যেন বলে আবার ডুবে গেল। আবার ভাসল, আবার ডুবল। ফরিদ বলল, ছেলেটাতো বড্ড যন্ত্রণা করছে।

আনিস চেঁচিয়ে বলল, ডাক্তার মরে যাচ্ছে। আমি সাঁতার জানি না। সাঁতার জানা কে আছেন? কে আছেন সাঁতার জানা?

ঝুপঝুপ করে দু'বার শব্দ হল। বিলু এবং মিলি দু'জনই পানিতে ঝাপিয়ে পড়েছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ডুবন্ত ডাক্তারের দিকে। ফরিদ চমৎকৃত। এই মেয়ে দুটি সাঁতার শিখল কবে?

আবার ঝুপ ঝুপ শব্দ। টগর এবং নিশাও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওদের তুলে আনার জন্যে আনিস এবং ফরিদকেও পানিতে লাফিয়ে পড়তে হল।

ডাক্তারের জ্ঞান ফিরল হলি ফেমিলি হাসপাতালে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আমি কোথায়?

মিলি বলল, আপনি হাসপাতালে।

'কেন?'

ফরিদ বিরক্ত গলায় বলল, উজবুকটাকে একটা চড় লাগাতো। আবার জিজ্ঞেস করে 'কেন?' ফাজিল কোথাকার।

ডাক্তার ক্ষীণ গলায় বলল, আমি কি এখনো বেঁচে আছি?

১০

রিকশা এসে থেমেছে নিরিবিলির সামনে। রিকশায় বসে আছে পাকুন্দিয়ার এমদাদ খোন্দকার। সঙ্গে তার নাতনী পুতুল। এমদাদ খোন্দকারের বয়স ষাটের উপরে। অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। মামলা মুকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষি দেয়া তাঁর আজীবন পেশা। গ্রামের জমি জমা সংক্রান্ত মামলায় তিনি দুই পক্ষেই শলা পরামর্শ দেন। নিয়ম থাকলে দু'পক্ষের হয়ে সাক্ষিও দিতেন, নিয়ম নেই বলে দিতে পারেন না। জাল দলিল তৈরীর ব্যাপারেও তার প্রবাদ তুল্য খ্যাতি আছে।

পুতুলের বয়স পনেরো। এবার মেট্রিক পাশ করেছে। ফাষ্ট ডিভিশন এবং দু'টা লেটার। রেজাল্ট বের হবার পর এমদাদ খোন্দকার খুব আফসোস করেছে–নাতনী যদি নকল করতে রাজি হত তাহলে ফাটাফাটি ব্যাপার হত, নকল ছাড়াই এই অবস্থা।

পুতুলকে নিয়ে এমদাদ খোন্দকার নিরিবিলিতে কেন এসেছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। পুতুলও কিছু জানে না। তাকে বলা হয়েছে ঢাকায় কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে, উঠবে সোবাহান সাহেবের বাড়ি। সোবাহান সাহেব তাদের কোন আত্মীয় না হলেও অপরিচিত নন। পাকুন্দিয়া গ্রামের কলেজটি তিনি নিজের টাকায় নিজের জমিতে করে দিয়েছেন। মেয়েদের একটি স্কুল দিয়েছেন, মসজিদ বানিয়েছেন। সোবাহান সাহেব তাঁর যৌবনের রোজগারের একটি বড় অংশ এই গ্রামে ঢেলে দিয়েছেন, কাজেই গ্রামের মানুষদের কাছে তিনি অপরিচিত নন। পুতুল তাঁকে চেনে। তাঁর স্কুল থেকেই সে মেট্রিক পাশ করেছে।

রিকশা থেকে নামতে নামতে পুতুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, কী বড় বাড়ি দেখছ দাদাজান?

এমদাদ মুখ বিকৃত করে বলল, পয়সার মা–বাপ নাই বাড়ি বড় হইব না–তো কি। চোরা পয়সা।

পুতুল দুঃখিত গলায় বলল, "চোরা–পয়সা? কি যে তুমি কও দাদাজান। এমন একটা বালা মানুষ। কত টেকা পয়সা দিছে গেরামে –'

'টেকা পয়সা দিলেই মানুষ বালা হয়? এদের শইল্যে আছে বদ রক্ত। এরারে আমি চিনি না? হাড়ে গোশতে চিনি।'

পুতুল কিছু বলল না। তার দাদাজানের চরিত্র সে জানে, মানুষের ভাল দিক তার চোখে পড়ে না। হয়ত কোনদিন পড়বেও না।

'পুতুল।'

'জ্বি দাদাজান।'

এমদাদ গলা নীচু করে বলল, 'সোবাহান সাহেবের দাদার বাপ ছিল বিখ্যাত চোর। এরা হইল চোর বংশ।'

'চুপ করতো দাদাজান।'

'আইচ্ছা চুপ করলাম।'

এমদাদ নাতনীকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। সোবাহান সাহেব বারান্দায় বসে ছিলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, চিনতে পারলাম নাতো। এমদাদ বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, 'আমি এমদাদ। পাকুন্দিয়ার এমদাদ খোন্দকার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা—আমি অবশ্যি এখনো চিনতে পারিনি।'

'চিনবার কথাও না—আমি হইলাম জুতার ময়লা। আর আপনে হইলেন—বটবৃক্ষ।'

'বটবৃক্ষ।'

'জ্বি বটবৃক্ষ। বটবৃক্ষে কি হয়—রাজ্যের পাখি আশ্রয় নেয়। আপনে হইলেন আমাদের আশ্রয়। বিপদে পড়ে আসছি জনাব।'

'কি বিপদ?'

'বলব। সব বলব। আপনেরে বলবনাতো বলব কারে? পুতুল ইনারে সেলাম কর। ইনারা মহাপুরুষ মানুষ। দেখলেই পূণ্য হয়।'

পুতুল এগিয়ে গেল। সোবাহান সাহেব পুতুলের মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বললেন, যাও ভিতরে যাও। হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া কর। তারপর শুনব কি সমস্যা।

এমদাদ বলল, ভাইসাব আমারে একটু নামাজের জায়গা দিতে হয়। দুই ওক্ত নামাজ কাজা হয়েছে। নামাজ কাজা হইলে ভাইসাব আমার মাথা ঠিক থাকে না।

'অজুর পানি লাগবে?'

'অজু লাগবে না।, অজু আছে। আমার সব ভাঙ্গে অজু ভাঙ্গে না। হা হা হা।'

সোবাহান সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। আর তখন ঘরে ঢুকল ফরিদ। এমদাদ বলল, ভাইজান পশ্চিম কোন দিকে?

ফরিদ বিরক্ত গলায় বলল, পশ্চিম কোন দিকে আমি কি জানি? আমি কি কম্পাস না কি?

'বাবাজীর পরিচয়?'

'বাবাজী ডাকবেন না।'

'রাগ করেন কেন ভাই সাহেব।'

'আপনি কে?'

'আমার নাম এমদাদ। এমদাদ খোন্দকার।'

'ও আচ্ছা।'

'ভাইসাব ভাল আছেন?'

ফরিদ অগ্নিদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল। এমদাদ ধাঁধায় পড়ে গেল। এই মানুষটির চরিত্র সে ঠিক বুঝতে পারছে না। মানুষের চরিত্র পুরোপুরি বুঝতে না পারা পর্যন্ত তার বড় অশান্তি লাগে।

১১

আনিস বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর লাগছে ছাদটা। টবের ফুলগাছগুলিতে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ছাদে আলো–ছায়ার নকশা। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছে, নকশাগুলিও বদলে যাচ্ছে। আনিস ভারী গলায় বলল,

আলোটুকু তোমায় দিলাম।
ছায়া থাক আমার কাছে।

আনিসের কথা শেষ হল না তার আগেই নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আওয়াজ পাওয়া গেল—কে আপনি? আপনি কে?

আনিস হকচকিয়ে গেল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে লম্বামত একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। নারী কণ্ঠ আবারো তীক্ষ্ণ গলায় বললে—আপনি কে?

''আমার নাম আনিস। আমি এ বাড়ির ভাড়াটে। আপনি কি ভয় পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি মানুষ। ভূত কখনো কবিতা বলে না। তাছাড়া ভূতের ছায়া পড়ে না। এই দেখুন আমার ছায়া পড়েছে।'

নারীমূর্তি কিছু বলল না। গায়ের চাদর টেনে দিল। তাতে তার মুখ আরো ঢাকা পড়ে গেল। আনিস বলল, আপনি কে জানতে পারি কি?

'আমার নাম বিলু। আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে।'

'ছাদে কি করছেন?'

'কিছু করছি না। টবের গাছগুলি দেখতে এসেছিলাম। মাঝখানে আপনি ভয় দেখিয়ে দিলেন।'

'সত্যি ভয় পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলুনতো?'

বিলু সহজ গলায় বলল, রহিমার মার ধারণা এ বাড়ির ছাদে না-কি ভূত আছে। সে প্রায়ই দেখে। আপনাকে হঠাৎ দেখে—আচ্ছা যাই।

বিলু সিঁড়ির দিকে রওনা হল। আনিস বলল, আপনার টবের গাছ দেখা হয়ে গেল?

'হ্যাঁ।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার আরো কিছুক্ষণ ছাদে থাকার ইচ্ছা ছিল, আমার কারণে চলে যাচ্ছেন।'

'আপনার ধারণা ঠিক না। আমার শীত শীত লাগছে। তাছাড়া অনেকক্ষণ ছাদে ছিলাম।'

আনিস সহজ গলায় বলল, আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে দুঃখিত।

বিলু হেসে ফেলল। বেশ শব্দ করে হাসল। আনিস হাসি শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এই হাসি তার পরিচিত। এ জীবনে অনেকবার শুনেছে। রেশমা এম্নি করেই হাসত, কিশোরীদের ঝনঝনে গলা, যে গলায় একই সঙ্গে আনন্দ এবং বিষাদ মাখানো।

বিলু বলল, যাই কেমন?

আনিস দ্বিতীয়বার চমকাল। রেশমাও কোথাও যাবার আগে মাথা কাত করে বলত, যাই কেমন? যেন অনুমতি প্রার্থনা করছে। যদি অনুমতি পাওয়া না যায় তাহলে যাবে না।

বিলু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সিঁড়ির মাথায় মূর্তির মত আনিস দাঁড়িয়ে। সে ফিস ফিস করে বলল, আলোটুকু তোমায় দিলাম। ছায়া থাক আমার কাছে।

তার ভাল লাগছে না। কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে। অনেক অনেক দূরের দেশ থেকে যেন হঠাৎ রেশমা উঠে এল। এ কেমন করে হয়? যে চলে গেছে সে আর আসে না। মানুষের কোন বিকল্প হয় না। কি যেন কথাগুলি? এ পৃথিবী একবার পায় তারে কোন দিন পায় নাকো আর, লাইনগুলি কি ঠিক আছে না ভুল টুল কিছু হল?

১২

এমদাদ এবং তার নাতনীকে থাকার জন্যে যে ঘরটা দেয়া হয়েছে সে ঘর এমদাদের খুবই পছন্দ হল। সে তিনবার বলল, দক্ষিণ দুয়ারী জানালা লক্ষ্য করে দেখ। ঘুম হবে তোফা। পুতুল শুকনো গলায় বলল, ঘুম ভাল হইলেই ভাল। আরাম কইরা ঘুমাও।

'খাটও দুইটা আছে। একটা তোর একটা আমার। ব্যবস্থা ভালই। কি কস পুতুল?'

পুতুল চুপ করে রইল। এমদাদ বলল, ভয়ে ভয়ে ছিলাম বুঝলি। কিছুই বলা যায় না। যদি চাকর বাকরের ঘর দিয়া বসে। দিয়া বসতেও তো পারে। মানী লোকের মানতো সবাই দেখে না। আরে আরে কারবার দেইখ্যা যা। ঘরের লগে পেসাবখানা। এলাহী কারবার।

আনন্দে এমদাদের মুখ ঝলমল করছে। শুধু পুতুল মুখ কাল করে রেখেছে। কিছুতেই তার মন বসছে না। অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হবার কষ্ট ও যন্ত্রণা সে তার ক্ষুদ্র জীবনে অনেকবার ভোগ করেছে। এখন আবার শুরু হল। ইচ্ছা মৃত্যুর ক্ষমতা যদি মানুষের থাকতো তাহলে বড় ভাল হত। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।

'ও পুতুল।'

'কি দাদাজান?'

'ঘর ভালই দিছে ঠিক না?'

'হুঁ।'

'এখন খিয়াল রাখবি সবের সাথে যেন ভাল ব্যবহার হয়। যে যা কয় শুনবি আর মুখে বলবি–জ্বি কথা ঠিক। এই কথার উপরে কথা নাই। গেরাম দেশে লোক বলে মুখের কথায় চিড়া ভিজে না–মিথ্যা কথা, মুখের কথায় সব ভিজে। তোর মুখ এমন শুকনা দেহায় ক্যানরে পুতুল?'

'এইখানে কদ্দিন থাকবা?'

'আসতে না আসতেই কদ্দিন থাকবা? থাকা না থাকা নিয়া তুই চিন্তা করবি না। এইটা আমার উপরে ছাইড়া দে। যা হাত মুখ ধুইয়া আয় চাইরডা দানাপানি মুখে দেই। এই বাড়ির খাওয়া খাদ্যও ভাল হওনের কথা।'

এমদাদের আশংকা ছিল হয়ত চাকর বাকরদের সঙ্গে মেঝেতে পাটি পেতে খেতে দেবে। যদি দেয় তাহলে বেইজ্জতির সীমা থাকবে না। দেখা গেল খাবার টেবিলেই খেতে দেয়া হয়েছে। বাড়ীর কর্ত্রী স্বয়ং তদারক করছেন। চিকন চালের ভাত, পাবদা মাছ, একটা শব্জি, মুগের ডাল। খাওয়ার শেষে পায়েস। তোফা ব্যবস্থা। মিনু বললেন, পেট ভরেছে তো এমদাদ সাহেব? ঘরে যা ছিল তাই দিয়েছি। নতুন কিছু করা হয়নি।

'কোন অসুবিধা হয় নাই। শুধু একটু দৈ থাকলে ভাল হইত। খাওয়ার পর দৈ থাকলে হজমের সহায়ক হয়। তার উপর আপনার ছোটবেলা থাইক্যা খাইয়া অভ্যাস।'

'ভবিষ্যতে আপনার জন্য দৈয়ের ব্যবস্থা রাখব।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। এখন মা জননী অবস্থা পইড়্যা গেছে। একটা সময় ছিল খোন্দকার বাড়ির সামনে দিয়া লোকজন ছাতা মাথায় দিয়ে যাইত না। নিয়ম ছিল না। জুতা খুইল্যা হাতে নিতে হইত বুঝলেন মা জননী।'

'তাই বুঝি।'

'জ্বি। একবার কি হইল শুনেন মা জননী। খোন্দকার বাড়ির সামনে দিয়ে এক লোক যাইতেছে হঠাৎ খক করে কাশ ফেলল। সাথে সাথে দারোয়ান ঘাড় ধরে নিয়া আসল–বলল হারামজাদা এত বড় সাহস। খোন্দকার বাড়ির সামনে কাশ ফেলস। নাকে খত দে। মাটিতে চাটা দে–তারপরে যা যেখানে যাবি।'

পুতুলের এইসব কথা শুনতে অসহ্য লাগে। না শুনেও উপায় নেই। দাদাজান যেখানে যাবে সেইখানেই এইসব বলবে। পুতুলের ধারণা সবই মিথ্যা কথা। সে খাওয়ার মাঝ পথে উঠে পড়ল। এমদাদের তাতে সুবিধাই হল। সে জরুরী একটা কথা বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে বলতে চাচ্ছে। পুতুল থাকায় বলতে পারছে না। এখন সুযোগ পাওয়া গেল।

'মা জননীকে একটা কথা বলতে চাইতেছিলাম।'

'বলুন।'

'বলতে শরম লাগছে। আবার না বলেও পারতেছি না। তারপর ভেবে দেখলাম আপনাদের না বললে কাদের বলব? আপনারা হইলেন বটবৃক্ষ।'

'ব্যাপারটা কি?'

'ট্রেইন থাইক্যা নামার সময় বুঝলেন মা জননী পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়া দেখি পকেট কাটা।'

'পকেট কাটা মানে?'

'ব্লেড দিয়ে পকেট সাফা করে দিছে। মানিব্যাগে চাইর'শ তেত্রিশ টাকা ছিল, সব শেষ। এখন পকেটে একটা কানা পয়সা নাই। কি বেইজ্জতী অবস্থা চিন্তা করেন মা জননী।'

'আচ্ছা ওর একটা ব্যবস্থা হবে।'

'হবে তাতো জানিই। বটবৃক্ষতো শুধু শুধু বলি না। চাইলতা গাছও তো বলতে পারতাম। পারতাম না?'

'আপনাকে কি মিষ্টি দেব? ঘরে মিষ্টি আছে।'

'দেন। আমার অবশ্য ডায়াবেটিস। মিষ্টি খাওয়া নিষেধ। এত নিষেধ শুনলে তো আর হয় না। কি বলেন মা জননী? মিষ্টি খাইতে পারবা না, ভালমন্দ খানা খাইতে পারবা না, সিগ্রেট খাইতে পারবা না–তাইলে খামুটা কি? বাতাস খামু?'

দীর্ঘদিন পর এমদাদের খুব চাপ খাওয়া হয়ে গেল। পেট দম সম হয়ে আছে। খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা দরকার। এদের বাড়ি ঘর, লোকজন সবার সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। সে দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। নাতনীটাকে এ বাড়িতে গছিয়ে যেতে হবে। কাজেই পরিবারের সদস্যদের নাড়ি নক্ষত্র জানা থাকা প্রয়োজন। তার কাছে অবশ্যি বেশির ভাগ সদস্যকেই বোকা কিসিমের বলে মনে হচ্ছে। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক থাকে বোকা সেই পরিবার সাধারণত সুখী হয়।

এমদাদ ফরিদের ঘরে উঁকি দিল। ফরিদ চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে আছে। ছবির পরিকল্পনা ভেঙ্গে যাওয়ায় তার মন খুবই খারাপ। এমদাদ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, বাবাজী কি জেগে আছেন?

ফরিদ কড়া চোখে তাকাল। থমথমে গলায় বলল, আপনি কি এর আগে কাউকে চোখ মেলে বসে বসে ঘুমুতে দেখেছেন যে আমাকে এ রকম একটা প্রশ্ন করলেন। দেখেছেন এইভাবে কাউকে ঘুমুতে?

এমদাদ প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। সহজ গলায় বলল, জ্বি জনাব দেখেছি। চোখ মেলে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঘুমাতে দেখেছি।

'কাকে দেখেছেন?'

'ঘোড়াকে। ঘোড়া দাঁড়ায়ে দাঁড়া'য় ঘুমায়।'

লোকটির স্পর্ধায় ফরিদ হতভম্ব।

'আমাকে দেখে আপনার কি ধারণা হয়েছে যে আমি একটা ঘোড়া?'

'জ্বি না।'

'আপনি বয়স্ক প্রবীণ একজন মানুষ বলেই আমি এই দফায় আপনাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে আর করা হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনি কখনো আমার ঘরে ঢুকবেন না।'

'জ্বিআচ্ছা।'

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন চলে যান।'

'একটা সিগারেটের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। বাবাজী কি সিগারেট খান?'

'খাই কিন্তু আপনাকে সিগারেট দেয়া হবে না। আপনি যেতে পারেন।'

'জ্বি আচ্ছা। জিনিষটা অবশ্য স্বাস্থ্যের জইন্যেও খারাপ।'

এমদাদ বের হয়ে এল। ফরিদের ঘরের ঘটনা তাকে খুব একটা বিচলিত করল না। বরংচ সে খানিকটা মজাই পেল। বড় ধরনের বেকুব সংসারে থাকা ভাল। যে সংসারে বড় ধরনের কোন বেকুব থাকে সেই সংসারে কখনো ভয়াবহ কোন সমস্যা হয় না। বোকাগুলি কোন না কোনভাবে সমস্যা পাতলা করে দেয়।এমদাদ রাস্তায় বের হল। চাপ খাওয়ার পর তার একটা সিগারেট দরকার।

অপরিচিত মানুষের কাছে টাকা চাওয়া সমস্যা কিন্তু সিগারেট চাওয়া কোন সমস্যা না। এমদাদ আধ ঘন্টার মধ্যে ছ'টা সিগারেট জোগাড় করে ফেলল। তার টেকনিকটা এ রকম– সিগারেট ধরিয়ে কোন ভদ্রলোক হয়ত আসছে–এমদাদ হাসি মুখে এগিয়ে যাবে।

'স্লামালিকুম ভাইসাব।'

অপরিচিত ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, আমাকে কিছু বলছেন?

'জ্বি।'

'বলুন–'

'আমার হার্টের অসুখ। ডাক্তার সিগারেট বন্ধ করে দিয়েছে। লুকিয়ে চুকিয়ে যে একটা টান দিব সেই উপায় নাই। ঘর থেকে একটা পয়সা দেয় না। ভাই এখন আপনি যদি একটা সিগারেট দেন জীবনটা রক্ষা হয়।'

''ডাক্তার যখন নিষেধ করেছে তখন তো সিগারেট খাওয়া উচিত হবে না।'

'কয়দিন আর বাঁচব বলেন? এখন সিগারেট খাওয়া না খাওয়া তো সমান।'

এরপর আর কথা চলে না। অপরিচিত ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করেন। এমদাদ হাসি মুখে বলে, দু'টা দিয়ে দেন ভাই সাহেব। রাতে খাওয়ার পর একটা খাব।

এমদাদ যখন সিগারেটের সঞ্চয় বাড়াতে ব্যস্ত তখন বাড়ির ভেতর ছোট্ট একটা নাটক হল। মিনু তিনশ টাকা হাতে নিয়ে পুতুলকে বললেন, মা এই টাকাটা তোমার দাদাকে দিও। পুতুল বিস্মিত হয়ে বলল, কিসের টাকা?

'উনার মানিব্যাগ পকেটমার হয়ে গেল। উনি বলছিলেন।'

'পুতুল কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, কই দাদাজানের কোন টাকাতো পকেটমার হয় নাই। ঐতো দাদাজানের মানিব্যাগ।'

'তবু তুমি টাকাটা রাখ।'

'না না–আমি টাকা রাখব না।'

মিনু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন–পুতুলের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি বেশ অবাক হলেন। মিনু কোমল গলায় বললেন, কি ব্যাপার পুতুল? পুতুল ধরা গলায় বলল–দাদাজান মিথ্যা কথা বললে আমার বড় কষ্ট হয়।

'হয়ত মিথ্যা কথা না। হয়ত উনি ভুলে গেছেন।'

'না উনি ভুলেন নাই। উনি সহজে কিছু ভুলেন না।'

পুতুলের কান্নার বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। মিনু পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলেন। এই মেয়েটা মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি নিতান্ত অপরিচিত এই মেয়েটির প্রতি এক ধরনের মমতা অনুভব করলেন।

নিরিবিলি বাড়িতে ক্রাইসিস তৈরী হতে বেশী সময় লাগে না। রাত আটটা দশ মিনিটে একটা ক্রাইসিস তৈরী হয়ে গেল। অবশ্যি এটা যে একটা ক্রাইসিস শুরুতে তা বোঝা গেল না। রাতের টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। সোবাহান সাহেব হাত ধুয়েছেন। তাঁর প্লেটে বিলু ভাত দিতে যাচ্ছে তিনি বললেন, ষ্টপ।

বিলু বলল, ভাত দেব না বাবা?

'না।'

'প্লেট বোধহয় ভাল করে ধোয়া হয়নি তাই না?'

'ওসব কিছু না।'

সোবাহান সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিনু বললেন, শরীর খারাপ লাগছে? সোবাহান সাহেব অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করলেন। এই শব্দের কোন অর্থ নেই।

রাত সাড়ে ন'টার দিকে জানা গেল ক্ষুধার প্রকৃত স্বরূপ কি তা জানার জন্যে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী দশদিন তিনি পানি ছাড়া কিছুই খাবেন না!

বিলু বাবাকে বোঝানোর জন্যে তাঁর ঘরে গেল। হাইপারটেনসনের রুগীকে অনিয়ম করলে চলে না। বিলুর সঙ্গে সোবাহান সাহেবের নিম্ন লিখিত কথাবার্তা হল।

'বিলুঃ বাবা তুমি ভাত খাবে না।'

বাবাঃ না।

বিলুঃ ভাত খাবে না কারণ তোমাকে ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে হবে?

বাবাঃ হ্যাঁ।

বিলুঃ কেন বলতো? ক্ষুধার স্বরূপ বুঝে তোমার হবেটা কি? তুমি যদি একজন কবি হতে তাহলে একটা কথা হত। ক্ষুধা সম্পর্কে কবিতা লিখতে। গদ্যকার হলে আমরা ক্ষুধার অসাধারণ বর্ণনা পেতাম। তুমি যদি রাজনীতিবিদ হতে তাহলেও লাভ ছিল, গরীব দুঃখীদের কষ্ট বুঝতে–তুমি বলতে গেলে কিছুই না। তাহলে তুমি কেন কষ্ট করছ?

বাবাঃ তুই ঘর থেকে যা। তুই বড় বিরক্ত করছিস।

বিলুঃ তুমি যদি কিছু না খাও তাহলে মা–ও খাবে না।

বাবাঃ সেটা তার ব্যাপার। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

বিলুঃ না খেয়ে কতদিন থাকবে?

বাবাঃ যত দিন পারি।

বিলুঃ অনশনে যাবার এই বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে বাবা? দোতলার আনিস সাহেব?

বাবাঃ হ্যাঁ।

বিলুঃ আমিও তাই ভেবেছিলাম।

বিলু দোতলায় উঠে এল। তার মুখ থম থম করছে।

আনিসের দুটি বাচ্চাই শুয়ে আছে। দু'জনের চোখই বন্ধ। কোন সাড়াশব্দ করছে না। কারণ আনিস ঘোষণা করেছে সবচে বেশী সময় যে কথা না বলে থাকতে পারবে সে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাবে। পুরস্কারের পাঁচটা টাকা খামে ভর্তি করে টেবিলের উপর রেখে দেয়া আছে। আনিসের ধারণা পুরস্কারের লোভে চুপ করে থাকতে থাকতে দু'জনই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। যদিও লক্ষণ তেমন মনে হচ্ছে না। টগর এবং নিশা মুখে কথা বলছে না ঠিকই কিন্তু ইশারায় কথা বলছে। দু'জনই হাত ও ঠোঁট নাড়ছে। এই সব কীর্তি কলাপ বিলুকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। দু'জনই চোখ বন্ধ করে মরার মত পড়ে রইল। যেন ঘুমুচ্ছে।

বিলু বলল, আনিস সাহেব, আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?

আনিস হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, অবশ্যই পারেন।

'আপনার সঙ্গে আমার ফরম্যাল পরিচয় হয়নি—আমার নাম····

আনিস বলল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনার হয়ত মনে নেই। আপনার নাম বিলু, বরিশাল মেডিকেল কলেজে পড়েন। একবার ছাদে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আপনি বসুন।

'না আমি বসার জন্যে আসিনি।'

'ঝগড়া করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে সবাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে। এতদিন পর্যন্ত এ বাড়ি আছি অথচ এখন পর্যন্ত একজন কেউ এসে বলল না, আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।

বিলু আনিসের হালকা কথাবার্তার ধার দিয়েও গেল না। কঠিন গলায় বলল, আপনি কি বাবাকে উপোষ দিতে বলেছেন?

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আপনি কি বাবাকে বুঝিয়েছেন ক্ষুধার স্বরূপ বোঝার জন্যে না খেয়ে থাকার প্রয়োজন।'

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, উনি কি না খেয়ে আছেন না-কি?

'হ্যাঁ।'

'কি সর্বনাশ। আমি শুধুমাত্র কথা প্রসঙ্গে বলছিলাম যে আমরা যারা সৌখিন সমস্যাবিদ তারা মূল সমস্যা নিয়ে ভাসা ভাসা কথাবার্তা বলি। কারণ মূল সমস্যা আমরা জানি না। ক্ষুধা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার তা আমরা অর্থাৎ তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমস্যা বিশারদরা জানি না। কারণ আমাদের কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না। রোজার সময় বেশ কিছু সময় ক্ষুধার্ত থাকি সেও খুবই সাময়িক ব্যাপার। তখন আমাদের মনের মধ্যে থাকে সূর্যটা ডুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য চলে আসবে। কাজেই ক্ষুধার স্বরূপ···

বিলু আনিসকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনাকে হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনার এই সব চমৎকার থিওরী দয়া করে নিজের মধ্যেই রাখবেন। বাবাকে এসবের মধ্যে জড়াবেন

না। উনি সব কিছুই খুব সিরিয়াসলি নেন। নিজের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করেন, আমাদের জন্যেও সমস্যা সৃষ্টি করেন। আমি কি বলছি আপনি কি বুঝতে পারছেন?'

'জ্বি পারছি।'

'সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন আরো একটা কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছি। কথাটা হচ্ছে–আপনি যে আপনার বাচ্চাদের মাধ্যমে আমাকে প্রেম নিবেদন করেছেন এতে আমি শুধু অবাক হয়েছি তাই না–দুঃখিত হয়েছি, রাগ করেছি, বিরক্ত হয়েছি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করা আমি পছন্দ করি না বলেই এতদিন চুপচাপ ছিলাম। আজ বলে ফেললাম।'

আনিসকে একটি কথা বলারও সুযোগ না দিয়ে বিলু নীচে নেমে গেল। আনিস ডাকল, টগর টগর। টগর জেগে আছে তবু কথা বলছে না। কথা বললেই বাজীতে হারতে হয়। আনিস বলল, টগর কথা বল এখন কথা বললে বাজীর কোন হেরফের হবে না। টগর।

'জ্বি।'

'বিলু মেয়েটিকে তুমি কি বলেছ?'

'আমি কিছু বলিনি–নিশা বলেছে।'

'নিশা, তুমি কি বলেছ?'

'আমার মনে নেই।'

'মনে করার চেষ্টা কর। তুমি কি বলেছ?'

নিশা কোন শব্দ করল না। টগর বলল, নিশা মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা। আনিস বলল, তোমার কি মনে আছে নিশা কি বলেছে?

'মনে আছে।'

'বলতো শুনি।'

'নিশা উনাকে বলেছে–আব্বু আপনাকে বিয়ে করবে। তখন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তখন আমরা আপনাকে আম্মু ডাকব।'

আনিস হতভম্ভ হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক কষ্টে বলল, ভদ্র মহিলা নিশার কথা শুনে কি বলল?

'সে তখন বলল, টগর–তোমার বাবা এইসব কথা তোমাদের বলেছেন? আমি বললাম–হুঁ।'

'তুমি হুঁ বললে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তো কখনো এ রকম কথা বলিনি–তুমি হুঁ বললে কেন?'

'আর বলব না বাবা।'

নিশা ক্ষীণ স্বরে বলল, আমিও বলব না বাবা। এতক্ষণ সে জেগেই ছিল! কোন পর্যায়ে কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করবে এইটাই শুধু বুঝতে পারছিল না।

একটা মানুষ ক্ষুধা কেমন এটা জানার জন্যে না খেয়ে আছে এই ব্যাপারটা পুতুলকে অভিভূত করে ফেলেছে। সে কয়েকবার দাদাজানের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল–এমদাদ কোন পাত্তা দিল না। এম্নিতেই তার মেজাজ খারাপ, পকেট মারের ব্যাপারটায় উল্টা পাল্টা কথা বলে মেয়েটা তাকে ডুবিয়েছে। শুরুতেই বেইজ্জত হতে হল। এটাকে যে কোন ভাবেই হোক সামলাতে হবে। কি ভাবে সামলাবে তাই নিয়ে এমদাদ চিন্তা ভাবনা করছে– এর মধ্যে পুতুল ঘ্যান ঘ্যান করছে সোবহান সাহেবের না খাওয়া নিয়ে। এই মেয়েটাকে কড়া একটা ধমক দেয়া দরকার। ধমক দিতেও ইচ্ছা করছে না!

'ও দাদাজান ঘুমাইলা?'

'না।'

'কেমন আশ্চর্য মানুষ দেখলা দাদাজান? ক্ষুধা কেমন জিনিষ এইটা জাননের জইন্যে না খাইয়া আছে।'

'দুনিয়াডা ভর্তি বেকুবে-এইডাও বেকুবির এক নমুনা।'

'ছিঃ দাদাজান-এমন কথা কইও না।'

'এই বুড়া বেকুব তো বেকুবই, তুইও বেকুব। তুই আমার সাথে কথা কইস না।'

'আমি কি দোষ করলাম দাদাজান?'

'চুপ, কোন কথা না।'

বুড়ো বয়সের ব্যধি রাতে ঘুম হয় না। এমদাদ রাত দেড়টায় ঘুমের আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে বসে থাকতেও আরাম। মশা না থাকলে পাটি পেতে বারান্দায় ঘুমানোরই ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু বড্ড মশা।

মিনু দরজা বন্ধ করতে এসে দেখেন এমদাদ সাহেব বারান্দার ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে আছেন। হাতে সিগারেট। তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, কে এমদাদ সাহেব না?

'জ্বি মা জননী।'

'এত রাতে এখানে কি করছেন?'

'মনটা খুব খারাপ। ঘুম আসে না।'

'মন খারাপ কেন?'

'বাড়ির কর্তা না খেয়ে ঘুমিয়ে আছে এই জন্যেই মনটা খারাপ মা জননী! আমরা হইলাম গেরামের মানুষ, ক্ষুধা পেটে কেউ ঘুমাইতে গেছে শুনলে মনটা খারাপ হয়।'

'ঐসব নিয়ে ভাববেন না। বিলুর বাবার এই রকম পাগলামী আছে। সকালে দেখবেন ঠিকই নাশতা করছে।'

'শুনে বড় ভাল লাগছে মা জননী।'

'আসুন ভেতরে চলে আসুন। আমি দরজা বন্ধ করে দেব।'

এমদাদ ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আরেকটা বিষয় আপনেরে বলা হয় নাই মা জননী- মানিব্যাগের বিষয়ে! মানিব্যাগ ছিল পুতুলের কাছে। মাইয়া খুব সাবধানতো-গুছায়ে রাখছে। এদিকে আমার পাঞ্জাবীর পকেটে ছিল রুমাল। পকেটমার সেই রুমাল নিয়ে চলে গেছে। হা হা হা।

মিনু বললেন, টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে বলবেন। সংকোচ করবেন না।

'আলহামদুলিল্লাহ। কোন সংকোচ করব না-আপনারা হইলেন বটবৃক্ষ।'

'যান ঘুমুতে যান।'

'জ্বি আচ্ছা। ঘুম আসবে না তবু শুইয়া থাকব। বাড়ির আসল লোক দানাপানি খায় নাই- এরপরেও কি ঘুম আসে কন মা জননী?'

'এইসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। সকাল হলেই দেখবেন খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে। উদ্দেশ্য তো আর কিছু না। উদ্দেশ্য হলো আমাকে যন্ত্রণা দেয়া।'

'এই কথা মুখে উচ্চারণ করবেন না মা জননী-ক্ষুধা কি যে বুঝতে চায় সে কি সাধারণ লোক? সেতো বলতে গেলে আল্লাহর অলি। ঠিক বলছি না-মা জননী?'

মিনু জবাব দিলেন না। এই লোক কি মতলবে এসেছে কে জানে। বিনা কারণে আসে নি বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বড় কোন সমস্যা। সমস্যা টেনে টেনে তিনি এখন ক্লান্ত ও বিরক্ত। আর ভাল লাগে না।

১৩

সোবাহান সাহেব ভোরবেলায় কাপে করে এক কাপ পানি খেলেন। আর কিছুই খেলেন না। মিনু বললেন, তুমি সত্যি সত্যি কিছু মুখে দেবে না?

'না।'

'কেন?'

'কেনর জবাবতো দিয়েছি। আমি ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে চাই।'

রাগে দুঃখে মিনুর চোখে পানি এসে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ যদি এরকম যন্ত্রণা করে তাহলে কিভাবে হয়? মিলির ইউনিভার্সিটিতে যাবার খুব প্রয়োজন ছিল সে গেল না। বাসার আবহাওয়া মনে হচ্ছে ভাল না। বাবার প্রেসারের কি অবস্থা কে জানে। ডাক্তারকে খবর দেয়া প্রয়োজন। তবে এক্ষুণী ছুটে যাওয়ার দরকার নেই। দুপুর পর্যন্ত যাক তারপর দেখা যাবে।

দুপুরে ফরিদ দুলাভাইয়ের অনশনের খবর পেল। তার উৎসাহের সীমা রইল না। কাদেরকে ডেকে বলল, সাবজেক্ট পাওয়া গেছে– অসাধারণ সাবজেক্ট–ছবি হবে ক্ষুধা নিয়ে। ক্ষুধা কি একজন জানতে চাচ্ছে। ক্যামেরা তার মুখের উপর ধরে রাখা। মাঝে মাঝে ক্যামেরা সরে নানান ধরনের খাবার দাবারের উপর চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে তার মুখে। লোকটার অবস্থা দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃষ্ণা। ক্যামেরা প্যান করে চলে গেল ঝর্ণায়। ঝির ঝির করে ঝর্ণার পানি পড়ছে–অথচ ঐ মানুষটির মুখে এক ফোটা পানি নেই। ক্যামেরা চলে গেল আকাশের মেঘে।

কাদের উৎসাহী গলায় বলল, আবার ছবি হইব মামা?

ফরিদ বলল, ছবি হবে না মানে? একটা প্রজেক্ট ফেল করেছে বলে সব ক'টা প্রজেক্ট ফেল করবে নাকি? বলতে গেলে আজ থেকেই ছবির কাজ শুরু হল। ছবির নাম–হে ক্ষুধা।

'কি নাম কইলেন মামা?'

'হে ক্ষুধা।'

'হে–কথাডা বাদ দেন মামা। অপয়া কথা। এর আগের বারও 'হে' আছিল বইল্যা ছবি অয় নাই।'

'কথা মন্দ বলিস নি। তাহলে বরং 'হে'টা পেছনে নিয়ে যাই। ছবির নাম–'ক্ষুধা হে' কি বলিস?'

'মন্দ না।'

'কাগজ কলম দে। ইমিডিয়েট যে সব চিন্তা মাথায় আসছে সেগুলি নোট ডাউন করে ফেলি। দুলাভাইয়ের সঙ্গেও আলাপ দরকার। ছবিটা যখন তাঁকে নিয়েই হচ্ছে।'

কাদের ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমরার কোন পাট থাকত না মামা?'

'থাকবে। তবে সাইড রোল। সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হচ্ছেন দুলাভাই। দেখি আপার সঙ্গে ব্যাপারটা আগে ফয়সালা করে নেই।'

মিনু রাগ করে বিলুর ঘরে শুয়ে আছেন। সকালে তিনিও নাস্তা করেননি। তাঁর প্রচন্ড মাথা ধরেছে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে বাড়ি থেকে চলে যাবার কথাও মনে আসছে। রাগারাগী তাঁর স্বভাবে নেই তবু সবাই বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে ধমক খেয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন কেউ

যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। কাজেই ফরিদ যখন বিশাল একটা খাতা হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, আপা আসব?

তিনি কড়া গলায় বললেন, ভাগ এখান থেকে।

'তুমি যা বলবে তাই হবে কিন্তু তার আগে তোমার কয়েকটা মিনিট সময় আমাকে দিতে হবে। দুলাভাইকে নিয়ে ছবি করছি আপা। ছবির নাম ''ক্ষুধা হে।'' দুলাভাই সেখানে মানুষ না। দুলাভাই হচ্ছেন ক্যামেরা–যে ক্যামেরা ক্ষুধা কি বুঝতে চেষ্টা করছে। পনেরো মিনিটের ছবি। পনেরো মিনিটই যথেষ্ট। শেষ দৃশ্যটা নিয়েছি সুকান্তের কবিতা থেকে। ঘন নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। হঠাৎ সেই চাঁদটা হয়ে গেল একটা আটার রুটি। দুটা রোগা রোগা হাত আকাশ থেকে সেই চাঁদটা অর্থাৎ রুটিটা নামিয়ে এনে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল। কেমন হবে আপা বলতো? অসাধারণ না?'

মিনু একটিও কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ফরিদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। সে নিজের মনে বকবক করতে থাকুক।

মানুষের অবহেলা ফরিদকে তেমন বিচলিত করে না। এবারো করল না। আসলে এই মুহূর্তে ক্ষুধা হে ছবির শেষ দৃশ্য তাকে অভিভূত করে রেখেছে। রোগা রোগা দু'টা হাত আকাশ থেকে চাঁদটা নামিয়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে কপ কপ করে খেয়ে ফেলছে। এই দৃশ্যের কোন তুলনা হয় না।

ফরিদ ঘর থেকে বের হয়েই পুতুলের মুখোমুখি পড়ে গেল। ফরিদ কড়া গলায় বলল, এই যে মেয়ে দাঁড়াও তো। দেখি হাত দু'টা মেলতো। পুতুল ভয়ে ভয়ে হাত মেলল।

হঁ রোগা রোগা হাত আছে–মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে হবে। তুমি কি একটা কাজ করতে পারবে?'

'কি কাজ?'

'অতি সামান্য কাজ। পারবে কি পারবে না সেটা বল।'

পুতুল ক্ষীণ স্বরে বলল, পারব।

'ভেরী গুড। কাজটা অতি সামান্য। আকাশ থেকে চাঁদটা টেনে নামাবে তারপর ছিড়ে কুচি কুচি করে খেয়ে ফেলবে!'

পুতুল অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। তার সব চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেছে।

ফরিদ দাঁড়াল না–লম্বা লম্বা পা ফেলে বারান্দায় চলে গেল। ছবিটা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবা দরকার। খুবই ঠান্ডা মাথায়। দরকার হলে ছবির লেংথ কমিয়ে পনেরো থেকে দশ মিনিটে নিয়ে আসতে হবে। তবে সেই দশ মিনিটও হবে অসাধারণ দশ মিনিট–গোল্ডেন মিনিটস!

১৪

যতটা কষ্ট হবে বলে ভেবেছিলেন ততটা কষ্ট সোবাহান সাহেবের হচ্ছে না। কষ্ট একটিই, পরিবারের সদস্যরা সবাই বড় বিরক্ত করছে। এদের যন্ত্রণায় বড় কিছু করা যায় না। দৃষ্টিটাকে এরা কিছুতেই ছড়িয়ে দিতে পারে না। কয়েকটা দিন না খেয়ে থাকা যে কঠিন কিছু না এটা তারা বুঝে না।

সোবাহান সাহেব একটা বড় খাতায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও লিখে রাখছেন। খুব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছেন। তেমন গুছিয়ে লিখতে পারছেন না। কিছুক্ষণ লেখালেখি করলেই মাথায় চাপ পড়ছে। তাঁর ডায়েরীর কিছু কিছু অংশ এরকম

বুধবার

রাত দশটা পাঁচ।

অনশন পর্ব শুরু করা গেল। এই অনশন দাবী আদায়ের অনশন নয়। এই অনশন নিজেকে জানার অনশন। আমি ক্ষুধার প্রকৃত স্বরূপ জানতে চাই। আমি এর ভয়াবহ রূপ জানতে চাই। যদি জানতে পারি তাহলে হয়তবা ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ ধারণা হবে। এই যে পৃথিবী জুড়ে হত্যাকান্ড হচ্ছে এর মূল কারণগুলির একটি নিশ্চয়ই ক্ষুধা। আজকের খবরের কাগজের একটি খবর দেখে অত্যন্ত বিষন্ন বোধ করেছি। সাভার উপজেলার জনৈক কালু মিয়া অভাবে অতিষ্ট হয়ে তার স্ত্রী, ছ'বছরের পুত্র এবং তিন বছরের কন্যাকে হত্যা করে পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছে। স্বীকারোক্তি মূলক জবান বন্দিতে বলেছে ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে সে এটা করেছে। হায়রে ক্ষুধা। অথচ এই সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

বৃহস্পতিবার

ভোর এগারোটা।

আমি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছি। আমি একটা পরীক্ষা করছি তাও তারা করতে দেবে না। তাদের ধারণা হয়েছে অল্প কয়েক ঘন্টা না খেয়ে থাকার কারণে আমি মারা যাব। মৃত্যু এত সহজ নয়। বিয়াল্লিশ দিন শুধুমাত্র পানি খেয়ে জীবিত থাকার রেকর্ড আছে। এরা এই জিনিষটা বুঝতে চায় না। আমার মৃত্যু প্রসঙ্গে এদের অতিরিক্ত সচেতনতাও আমার ভাল লাগছে না। মৃত্যু একটি অমোঘ ব্যাপার। একে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? পবিত্র কোরান শরীফেতো স্পষ্ট উল্লেখ আছে প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে ধর্মগ্রন্থ পাঠের একটা প্রবল ইচ্ছা বোধ করছি। ক্ষুধার্ত মানুষ কি পরলৌকিক চিন্তা করে? একটি জরুরী বিষয় লিখে রাখা দরকার বোধ করছি। মিনু বড় কান্নাকাটি করছে। এত কান্নাকাটির কি আছে তাতো বুঝতে পারছি না। বিলু এসে বলে গেল আমি যদি না খাই তাহলে তার মা-ও খাওয়া বন্ধ করে দেবে। এ দেখি আরেক যন্ত্রণা হল।

বৃহস্পতিবার

বেলা একটা দশ মিনিট।

ফরিদের ফাজলামীর সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। শুনলাম এই গাধা এখন না-কি আমাকে নিয়ে ছবি করবে। ছবির নাম ''ক্ষুধা হে!'' এই গাধাটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারলে মন শান্ত হত। মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে তা করতে পারছি না। মিনু ফরিদকে বড়ই পছন্দ করে। আমিও করি। কেন করি তা জানি না। ভাল কথা এখন একটু কষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে। মাথা ঘুরছে। প্রেসারের কোন সমস্যা কি না কে জানে।

ক্রমাগত ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করার চেষ্টা করছি। পবিত্র কোরান শরীফে যে এত সুন্দর সুন্দর অংশ আছে আগে লক্ষ্য করিনি। মূল আরবীতে পড়তে পারলে ভাল হত। বয়স কম থাকলে আরবী পড়া শুরু করতাম। সেই সময় নেই। এখন ঠিক করেছি কোরান শরীফের পছন্দের কিছু আয়াত লিখে রাখব-

"If it were His will
He could destroy you
O mankind, and create

Another race : for He
Hath power this to do.
(সূরা নিসা, ১৩৪ নং আয়াত)

আল্লাহতালা নতুন জাতি সৃষ্টি করার কথা বলছেন। যদি সত্যি সত্যি তিনি করতেন তাহলে কেমন হত সেই জাতি? তাদের কি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কামনা থাকত না? তারা এইসব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হত?

ফরিদ চোখে চশমা দিয়ে গভীর মনযোগে খাতায় শট ডিভিসন করছে। হাতে সময় নেই। দুলাভাইয়ের অনশন চলাকালীন সময়েই কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। একটা ফিস আই লেন্স দরকার টিক শটের জন্যে। এই লেন্সটাই জোগাড় হচ্ছে না।

'বাবাজী আসব?'

ফরিদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকাল। এমদাদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ফরিদ রাগী গলায় বলল, কি চান?

'কিছু না। আমার নাতনী অর্থাৎ পুতুল চিন্তার মইদ্যে পড়েছে—আফনে না—কি তারে বলেছেন আসমানের চাঁদ ধইরা নামাইয়া ছিড়া কুটি কুটি কইরা খাইয়া ফেলতে।'

'হ্যাঁ বলেছি।'

হতভম্ভ এমদাদ দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, খাইয়া ফেলতে বলছেন?

'হ্যাঁ বলেছি। কেন কোন অসুবিধা আছে?'

এমদাদ শুকনো গলায় বলল, জ্বিনা অসুবিধার কি? অসুবিধার কিছুই নাই।

'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'তাহলে দয়া করে ঘর থেকে বের হয়ে যান।'

'অবশ্যই অবশ্যই।'

এমদাদ প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বের হয়ে এল। এই লোকটির মাথা যে খানিকটা উলট পালট আছে তা সে শুরুতেই বুঝে গিয়েছিল। সেই উলট পালট যে এতখানি তা বোঝে নি। কিন্তু যে আকাশের চাঁদ ছিড়ে কুচি কুচি করে খেয়ে ফেলার কথা ভাবে তাকে সহজ পাগলের দলে ফেলা ঠিক হবে না। এর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে। পুতুলকেও বলে দিতে হবে যেন এই লোকের ত্রি সীমানায় না আসে।

১৫

মনসুরকে আজ বিকেলে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবে। সে এখন পুরোপুরি সুস্থ। ফুসফুসে পানি ঢুকে যাওয়ায় যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তা এখন নেই। আর হাসপাতালে পরে থাকার কোন মানে হয় না। অবশ্যি মনসুর চাচ্ছে আরো কিছুদিন থেকে যেতে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে তার মন্দ লাগে না। বই পত্র পড়া যায়। আরাম করে ঘুমানো যায়। সবচে বড় কথা প্রায় দিনই মিলি এসে দেখে যায়। সে হাসপাতাল ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই মিলি তাকে দেখতে আসবে না।

হাসপাতালের বিছানায় মনসুরের বেশীর ভাগ সময় মিলির কথা ভেবে ভেবেই কাটে। মিলিকে নিয়ে পেনসিল দিয়ে সে কবিতাও লিখেছে। সম্ভবত কিছুই হয়নি। কাউকে দেখাতে পারলে হত। দেখাতে লজ্জা লাগে। একটা কবিতা এরকম–

একটু আগে এসে ছিলেন মিলি
চারদিকে তাই এমন ঝিলিমিলি।
মনটা আমার হল উড়ু উড়ু।
বুকের ভেতর শব্দ দুরু দুরু।
যখন মিলি বিদায় নিতে চান
আমি বলি– একটু বসে যান।
হাত বাড়িয়ে আমার দু'হাত ধরুন
– – – – – – – – –

বাকিটা আর পারা যায় নি। ধরুনের সঙ্গে ভাল কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না। ধরুন, করুন, মরুন। কোনটাই ভাল লাগে না। আপাতত খাতা বন্ধ রেখে মনসুর গভীর মনোযোগে একটা চটি বই পড়ছে। বইটি ইংরেজীতে লেখা। বইয়ের বিষয় বস্তু হচ্ছে মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ। বইয়ের লেখক পনেরো বছর গবেষণা করার পর এই বই লিখেছেন এবং এই বইয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মেয়েদের বিষয়ে প্রচলিত অধিকাংশ ধারনাই মিথ্যা। আমাদের আগে বিশ্বাস ছিল মেয়েদের রূপের প্রশংসা করলে তারা খুশী হয়। এই বইয়ের লেখক দেখিয়েছেন যে রূপের প্রশংসায় অধিকাংশ মেয়ে বিরক্ত হয়।

বইটির ব্যাক কভারে প্রকাশক লিখেছেন–নারী চরিত্র বোঝার জন্যে বইটি অপরিহার্য। অবিবাহিত যুবক যারা সঙ্গী খুঁজছেন বইটি তাদের জন্য বাইবেল স্বরূপ। মনসুরের কাছেও তাই মনে হচ্ছে। বইটা আরো আগে হাতে এলে উপকার হত।

বইটির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের শিরোনাম–রসিকতা ও মেয়ে মানুষ। এখানে লেখক বলছেন–

'আমাদের একটি ধারণা আছে মেয়েরা রসিকতা পছন্দ করে। ধারণা সঠিক নয়। মেয়েরা রসিকতা একেবারেই পছন্দ করে না। কারণ কখনো কোন মেয়েকে রসিকতা করতে দেখা যায় না। কেউ যদি মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করে তাহলে মেয়েরা তার সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা পোষণ করে। এই ধারণা পাঁচশত মেয়েদের মাঝ থেকে জরীপের মাধ্যমে নেয়া।

ধারণা	শতকরা হিসাব
লোকটা ফাজিল	৬৫%
লোকটা চালবাজ	২০%
লোকটা বোকা	১০%
লোকটা চালাক	২%
	৯৭%

বাকি তিন ভাগ মহিলা কোন রকম মন্তব্য করতে রাজি হননি। কাজেই প্রিয় পাঠক আপনি যাই করুন মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করবেন না। যদি করতেই হয় খুব সহজ রসিকতা করবেন যা কোমলমতি শিশুরাও ধরতে পারে। যে সব রসিকতা বুঝতে বুদ্ধির প্রয়োজন ভুলেও সে সব

রসিকতা করবেন না। নিম্নে রসিকতার কিছু নমুনা দেয়া গেল। এইসব রসিকতা করা যেতে পারে।

(ক)

স্ত্রী স্বামীকে বলছেন, ওগো পাশের বাসার ভদ্রলোক কত ভাল। অফিসে যাবার সময় রোজ তাঁর স্ত্রীকে চুমু দিয়ে যান। তুমি এ রকম কর না কেন? স্বামী অবাক হয়ে বললেন, আমি কি করে করব? আমি কি ঐ ভদ্র মহিলাকে চিনি?

(মন্তব্যঃ জরীপে দেখা গেছে শতকরা ২৫ ভাগ মহিলা এই রসিকতা বুঝতে পারে না তবু হাসে। কাজেই একটু সাবধান থাকা ভাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যৌন বিষয়ক রসিকতা মেয়েরা না বুঝলেও খুব পছন্দ করে।)

(খ)

শিক্ষক জিজ্ঞেস করছেন সম্রাট শাজাহান কোথায় মারা গেছেন? ছাত্র বলল, ইতিহাস বই–এ সত্তুর পৃষ্ঠায়।

(মন্তব্যঃ এই রসিকতা শতকরা ৭৮ ভাগ মহিলা বুঝতে পারেন। যারা বুঝতে পারেন না। তাঁরা সাধারণত অবাক হয়ে বলেন, সত্তুর পৃষ্ঠায় মারা গেছে? আপনি তাহলে বলতে চাচ্ছেন সত্তুর নাম্বারটা আন–লাকি?)

(গ)

এক পাগলের খুব বই পড়ার নেশা। সব বই সে পড়ে না শুধু নাটকের বই পড়ে। পড়তে পড়তে নাটকের যাবতীয় বই সে পড়ে শেষ করে ফেলল। আরো বই চায়। উপায় না দেখে তখন তাকে একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি ধরিয়ে দেয়া হল। সে মহানন্দে দিন দশেক ধরে তাই পড়ছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল–কেমন লাগছে পড়তে?

পাগল বলল, অসাধারণ–তবে চরিত্রের সংখ্যা বেশী। মনে রাখতে একটু কষ্ট হচ্ছে।(মন্তব্যঃ এই রসিকতা কোন মহিলাই ধরতে পারেন না তবে সবাই খুব হাসেন। কেন হাসেন এটা একটা রহস্য। দেখা গিয়েছে অনেক মহিলা হাসতে হাসতে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয়ে যান। কাজেই এই রসিকতা করার আগে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল।)

মহিলাদের সঙ্গে রসিকতা করার সময় পাঞ্চ লাইনে যাবার আগেই উচ্চ স্বরে হাসা শুরু করা উচিত। যাতে মহিলারা বুঝতে পারেন কোথায় হাসতে হবে।

মনসুর যখন বইয়ের এই অংশে তখন মিলি ঢুকল। সে ডাক্তারকে বাসায় নিয়ে যেতে এসেছে। কারণ ছাব্বিশ ঘন্টা পার হয়েছে সোবাহান সাহেব তিন কাপ পানি ছাড়া কিছুই খাননি। তার শরীরের তাপ নেমে এসেছে। চোখ হয়েছে লালচে। আগে নিজেই বসে বসে লিখতেন এখন তাও পারছেন না।

মিলি মনসুরের পাশের চেয়ারে বসতে বসতে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল। মনসুর হতভম্ব। মিলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, খুব খারাপ খবর আছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

১৬

সোবাহান সাহেব কোন কিছু না খেয়ে ১৬৬ ঘন্টা পার করেছেন। মোটামুটি হাসি তামাশা হিসেবে যার শুরু হয়েছিল তার শেষটা সে রকম রইল না। মনসুর ঘোষণা করেছে আর বার

ঘন্টার ভেতর যদি কিছু খাওয়ানো না যায় তাহলে হাসপাতালে নিয়ে ফোর্স ফিডিং করা উচিত। রক্তে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ কমে গেছে।

একমাত্র ফরিদকেই পুরো ব্যাপারটায় আনন্দিত মনে হচ্ছে। তার ছবির কাজ এখনো শুরু হয়নি। কারণ চিত্রনাট্যে শেষ মুহূর্তে একটা রদ বদল করা হয়েছে। ফরিদ ঠিক করে পুরো দৃশ্যটি একটা গানের উপর করা হবে। গানটা এমন যার সঙ্গে ক্ষুধার কোন সম্পর্ক নেই। সেই গানও সিলেক্ট করা হয়েছে–'হলুদিয়া পাখি সোনার বরণ পাখিটি ছাড়িল কে।' গানের সঙ্গে ছবির যদিও কোন সম্পর্ক নেই তবু ছবিটা এমন ভাবে করা হবে যে একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাবে। খুবই কঠিন কাজ। তবে জীবনের আনন্দতো কঠিন কাজেই। সহজ কাজ সবাই পারে। কঠিন কাজ পারে ক'জনে?

ছবি নিয়ে মিলির সঙ্গে ছোটখাট ঝগড়ার মতও হল। মিলি চোখ মুখ লাল করে এসে বলল, একটা মানুষ মরে যাচ্ছে আর তুমি আছ ছবি নিয়ে?

ফরিদ বলেছে, জীবনটাই এরকম মিলি, কারো জন্যে কোন কিছু আটকে থাকে না। Life goes on.

'মামা তুমি পাথরের তৈরী একজন মানুষ।'

'তুই নেহায়েৎ ভুল বলিসনি।'

'একটা মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে আর তুমি কিনা বানাচ্ছ 'ক্ষুধা–হে।' মামা চক্ষু লজ্জারোতো একটা ব্যাপার আছে। আছে না?'

'শিল্প সাহিত্যের কাছে চক্ষু লজ্জা কিছু না–রে মা, শিল্প সাহিত্য চক্ষু লজ্জার অনেক উপরে।'

'তুমি কিছু মনে করো না মামা। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধিও কম।'

'না আমি কিছুই মনে করছি না। স্বয়ং সক্রেটিসকে লোকে গাধা বলেছে। আর্কিমিডিসকে ছোট বেলায় ডাকা হত সিকি বুদ্ধির মানুষ –বুঝলি?'

মিলি জবাব না দিয়ে উঠে পড়েছে। মামার সঙ্গে তর্ক করা অর্থহীন।

এ বাড়ির কান্ডকারখানা দেখে সবচে বেশী হকচকিয়ে গেছে এমদাদ। সে কল্পনাও করতে পারেনি সত্যি সত্যি একটা মানুষ না খেয়ে এতদিন পার করে দেবে। এরকম অবস্থায় কোন কথা বার্তাওতো বলা যায় না। যে পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল সেই পরিকল্পনা কোন কাজে আসছে না। নাতনীটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দেয়া। গ্রামের বাড়িতে তাকে রাখা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। কিছু গুন্ডা পান্ডা ছেলে পেছনে লেগেছে। এদের মতলব ভাল না। গত বর্ষায় বদি শেখের বৌকে ধরে পাটক্ষেতে নিয়ে গেছে। লজ্জায় এই ঘটনা বদি শেখ কাউকে বলেনি। না বললেও কারোর জানতে বাকি নেই। ঘটনার নায়করাই সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। এদেরই একজন পুতুলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং আকারান্তরে জানিয়েছে প্রস্তাবে রাজি না হলে পাটক্ষেতে যেতে হবে। এর পর আর গ্রামে থাকা সম্ভব না। এমদাদ নাতনীকে নিয়ে বলতে গেলে পালিয়েই এসেছে। সে জানে ঘটনা শুনলে সোবাহান সাহেব একটা ব্যবস্থা করবেনই কিন্তু ঘটনা শুনানোর সময়ইতো হল না। না খেয়ে মর মর অবস্থা।

সব মন্দ জিনিষের একটা ভাল দিকও আছে। সোবাহান সাহেবের এই অসুখের ফলে মনসুর নামের এই ডাক্তার ছেলেটার সঙ্গে পরিচয় হল। এই ছেলে ঘন ঘন আসছে। পুতুলের সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে দেয়া কি একেবারেই অসম্ভব? পুতুল দেখতে তো খারাপ না। চোখে

কাজল টাজল দিলে মাশাআল্লাহ ভাল লাগে। তবে মেয়েটা হয়েছে বদ। যেটা করতে বলা হবে সেটা করবে না।

একটু সেজেগুজে ডাক্তারের সামনে হাঁটাহাটি করলে কি কোন অসুবিধে আছে? এক কাপ চা এনে দিবে। এক গ্লাস পানি আনবে। যাবার সময় বলবে, ডাক্তার সাব ভাল আছেন? আবার আসবেন। একটু ঢং ঢাং না করলে হয়? দুনিয়াটাই হচ্ছে ঢং ঢাংয়ের।

অবশ্যি এমদাদ চেষ্টার ক্রটি করছে না। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলেই গল্প গুজব করছে। একটা সম্পর্ক পাতানের চেষ্টায় আছে। কোনমতে একটা সম্পর্ক তৈরী করে ফেললে নিশ্চিন্ত। সেই সম্পর্কও করা যাচ্ছে না। ডাক্তারকেও একটু বোকা কিসিমের বলে মনে হচ্ছে। এটা একদিক দিয়ে ভাল। স্বামী হিসেবে বোকাদের কোন তুলনা নেই। যত বোকা তত ভাল স্বামী। ডাক্তারটা কত বোকা সেটাও ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তবে এই বাড়ির মিলি মেয়েটির সঙ্গে বড় বেশি খাতির। এটা একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। গতকাল অবশ্যি ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে কিছু কাজ করা হয়েছে। এইসব কাজ ঠান্ডা মাথায় করতে হয়। এখন বয়স হয়ে গেছে। মাথা আগের মত ঠান্ডা না। গতকাল ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা যা হল তা হচ্ছে–

এমদাদঃ এই যে ডাক্তার ভাই, শরীর ভাল? চিনছেন তো আমারে? আমি এমদাদ। পাকুন্দিয়ার এমদাদ। আমার নাতনীটার শরীরটা খারাপ। ভাবলাম একটু অষুধ আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাই।

ডাক্তারঃ কি অসুখ?

এমদাদঃ মাথার যন্ত্রণা। আরো কি সব যেন আছে। আমি নিয়ে আসবনে আপনের কাছে। দেখে শুনে যাই হোক একটা কিছু দিবেন। আপনের উপরে আবার খুব ভক্তি। আপনাকে খুবই ভাল পায়।

এই কথায় ডাক্তার খানিকক্ষণ খুক খুক করে কাশল। এটা খুব ভাল লক্ষণ। কাজেই কথাবার্তা এই লাইনেই চালানো ভাল। এমদাদ গলার স্বর খানিকটা নীচু করে বলল, মেয়েদের মন বোঝা বড় মুশকিল। ঐ দিন আপনারে নিয়া বিরাট ঝগড়া মিলির সঙ্গে।

ডাক্তারঃ (খানিকটা উৎসাহী) মিলির সঙ্গে ঝগড়া?

এমদাদঃ জ্বি।

ডাক্তারঃ কি জন্যে বলুন তো?

এমদাদঃ মেয়েছেলের কারবারতো। মিলি একদিন বলল–ডাক্তার সাহেব বেকুব কিসিমের লোক এই শুইন্যা পুতুল রাগ করল।

ডাক্তারঃ (হতভম্ব) আমাকে বেকুব কিসিমের লোক বলল?

এমদাদঃ বাদ দেন। বাদ দেন। মেয়েছেলের কারবার, তামশা কইরা বলছে। মেয়েছেলেরা তামশা কইরা অনেক কথা কয়। হে হে হে।

এমদাদ চেষ্টার চূড়ান্ত করছে, কিন্তু একা একা কত করবে? পুতুলের নিজেরও তো সাহায্য দরকার। সে যদি কাঠের টুকরার মত থাকে তাহলে হবে কিভাবে? শাড়িটা বদলাতে বললে বদলায় না। চুলটা আঁচড়িয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ক্ষতিতো কিছু নাই?

তাছাড়া অবস্থা এমন কিছু করারও সময় না। একজন ঝিম ধরে পড়ে আছে। এখন যায় তখন যায় অবস্থা। ক্ষুধা কি জিনিব বুঝতে চায়। আরে বাবা আল্লাহতালার ইচ্ছা না ক্ষুধা কি

জিনিষ তুমি বোঝ। যদি আল্লাহতালার সেই রকম ইচ্ছা থাকত তোমারে গরীব বানিয়ে পাঠাত। খামাখা ভড়ং।

এ বাড়িতে এমদাদের সব সময় মুখ শুকনা করে থাকতে হয়। ভাব দেখাতে হয় যে চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। এইসব কি ভাল লাগে? আর বুড়া যদি সত্যি সত্যি মরে যায় তাহলে তো সাড়ে সর্বনাশ। সে যাবে কোথায়?

সন্ধ্যাবেলা আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করল। কালবৈশাখীর প্রথম ঝাপ্টা। হাওয়ায় ঘরের দরজা জানালা উড়িয়ে নিয়ে যাবার মত অবস্থা। টগর এবং নিশার আনন্দের সীমা নেই। বৃষ্টির মধ্যে খুব লাফাচ্ছে। বৃষ্টির জল অসম্ভব ঠান্ডা। শীতে একেকজন থর থর করে কাঁপছে তাতেও আনন্দ বাঁধ মানছে না। আনিস ঘর থেকে এই দৃশ্য দেখছে তবে চুপচাপই আছে। তার মুখের মৃদু হাসি দেখে মনে হচ্ছে সেও বেশ মজাই পাচ্ছে হয়ত সে পানিতে নামবে। টগর বলল, বাবা পানিতে নামবে?

আনিস হাসি মুখে বলল, ঠান্ডা কেমন তার উপর নির্ভর করছে।

নিশা শীতে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, একদম ঠান্ডা না বাবা। গরম পানি।

'খুব গরম?'

'হ্যাঁ খুব গরম।'

আনিসও নেমে পড়ল। শীতে জমে যাবার মত অবস্থা। তবু বাচ্চাদের সঙ্গে হৈ চৈ করে ভিজতে ভাল লাগছে। সবার ঠান্ডা লেগে যাবে বলাই বাহুল্য। নিশা এখনই হাঁচি দিচ্ছে।

আর বোধ হয় মেয়েটাকে পানিতে থাকতে দেয়া উচিত হবে না কিন্তু ওঠে যেতে বলতেও খারাপ লাগছে। করুক, একটু আনন্দ–করুক।

নিশা শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, বাবা আজ সারা রাত আমরা পানিতে ভিজব–কেমন?

'আমার আপত্তি নেই।'

পানিতে বেশীক্ষণ ভেজা গেল না। শীলা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দৌড়ে সবাইকে ঘরে ঢুকতে হল। তিনজনেই শীতে থর থর করে কাঁপছে। নিশার গায়ে সম্ভবত জ্বর উঠেই গেছে। সে একটু পর পরই হাঁচি দিচ্ছে। বিলুর কাছ থেকে অষুধ এনে খাইয়ে দেয়া দরকার। আনিসকে বিলুর কাছে যেতে হল না। বিলু নিজেই এসে উপস্থিত।

বিলু মুখ শুকনো করে বলল, আপনারা মনে হচ্ছে খুব মজা করলেন ! আনিস বলল, হ্যাঁ করলাম। অনেকদিন পর পানিতে ভিজলাম। যাকে বলে শৈশবে ফিরে যাওয়া।

'আপনার সঙ্গে একটা কথা বলার জন্যে এসেছিলাম আনিস সাহেব।'

'বলুন।'

'আপনার বাচ্চাগুলির গা মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে দিন তারপর আমার সঙ্গে নিচে আসুন,বলছি।'

'মনে হচ্ছে খারাপ খবর।'

'আমাদের জন্যে খারাপ খবর আপনার জন্যে কেমন তা জানি না। বাবার ব্লাড প্রেসার খুব ফল করেছে।'

'বলেন কি?'

'বাড়ির একটা মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে পড়ে আছে এবং তা পড়ে আছে আপনার উল্টা পাল্টা কথা শুনে অথচ আপনি একদিনও তাঁকে দেখতে যান নি।'

আনিস বলল 'চলুন যাই দেখে আসি।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'আমি ঠাট্টা করি না। একজন মানুষ ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে চাচ্ছে এটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে বলেই আমি চুপ করে আছি।'

'একজন মানুষ মরে যাবে তারপরও আপনি চুপ করে থাকবেন?'

আনিস হাসি মুখে বলল, মানুষ এত সহজে মরে না। চলুন যাই অনশন ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আসি। বিলু বিস্মিত গলায় বলল, 'আমরা সবাই মিলে যা পারলাম না আপনি তাই করবেন। অনশন ভাঙ্গাবেন?'

'হ্যাঁ।'

আনিস সোবাহান সাহেবের সঙ্গে কি কথা বলল কেউ জানল না কারণ ঘরে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল আনিস ঘর থেকে বেরুবার পর পরই সোবাহান সাহেব বললেন, আমাকে এক গ্লাস দুধ দাও।

খবর শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ফরিদ। এটা কি কথা? চিত্রনাট্য এখন কমপ্লিট আর এখনি কি-না অনশন ভঙ্গ। আর দু'দিন পর ভাঙ্গলে অসুবিধাটা কি হত? এই দু'দিনে ইম্পর্টেন্ট কিছু সট নিয়ে নেয়া যেত! মহৎ কাজে পদে পদে বাধা আসে এটাই হচ্ছে খাটি কথা। মহাপুরুষদের যে বাণী–তোমার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় এটাই হচ্ছে আদি সত্য।

রাগ করে রাতে ফরিদ ভাত খেল না। এই রাগ তার নিজের উপর না, দুলাভাইয়ের উপরও না। এই রাগ হচ্ছে প্রকৃতির উপর। যে প্রকৃতি পদে পদে মানুষকে আশাহত করে।

সোবাহান সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। মিলি বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ডাক্তার পাশেই আছে। ডাক্তারের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে কারণ এই অনশনের কারণে খুব ঘন ঘন সে এ বাড়িতে আসতে পেরেছে। এখন অনশন ভাঙ্গায় একটু সমস্যা হয়েছে আর হয়ত ঘন ঘন আসা সম্ভব হবে না। তবে ভাগ্য যদি ভাল হয় তাহলে হয়ত তৃষ্ণার্ত মানুষের কষ্ট বোঝার জন্যে এই লোক পানি খাওয়া বন্ধ করবেন। সেই সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ মনে হচ্ছে। মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব আপনি এখনো বসে আছেন কেন চলে যান। মনসুর বলল, না আমার কোন অসুবিধা নেই। এগারোটার দিকে প্রেসারটা মেপে তারপর যাব।

'তাহলে আসুন আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খান।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মিলি হাসতে হাসতে বলল, কেউ ভাত খেতে বলতেই আপনি বুঝি রাজি হয়ে যান? এ রকম চট করে রাজী হওয়াটা কি ভাল? আমাদের হয়ত ভাত খাওয়াবার ইচ্ছা নেই ভদ্রতা করে বলেছি।'

মিলি কেমন হাসতে হাসতে কথাগুলি বলছে। শুনতে কি ভালই না লাগছে। আচ্ছা এই মেয়ের সঙ্গে তার যদি কোনদিন বিয়ে হয় তাহলে সেকি কোনদিন তার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করবে? না করবে না। কোনদিন না। এই মেয়েকে সে কোনদিন কোন কড়া কথা বলতে পারবে না। এই মেয়ের খুব কঠিন কথায়ও সে রাগ করতে পারবে না।

'ডাক্তার সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি আনিস সাহেবের ছোট মেয়েটাকে একবার দেখে যাবেন। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাঁধিয়েছে। আপনি বরং উপর থেকে রুগী দেখে আসুন–আমি ভাত দিতে বলি।

'জ্বি আচ্ছা।'

নিশার জ্বর তেমন কিছু না। একশ'র কিছু বেশী। তবে লাংস পরিষ্কার না। কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। আনিস বলল, কেমন দেখলেন?

মনসুর বলল, ভাল।

'সত্যি ভাল তো? আপনার গলায় তেমন জোর পেলাম না।'

'লাংসে কেমন ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে বুকে বোধ হয় কফ জমে গেছে। সকাল পর্যন্ত দেখব তারপর এন্টিবায়োটিক দেব।'

'আপনার ভিজিট কত ডাক্তার সাহেব?'

মনসুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আনিস সাহেব। আমি বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভাল মিশতে পারি না। কিছু কিছু মানুষ আছে ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে না। আমি সেই রকম। আমি আপনার বাচ্চা দু'টাকে যে কি পরিমাণ পছন্দ করি তা ওরা জানে না কিন্তু আমি জানি, আমার হৃদয় জানে। আপনি ভিজিটের কথাটা তুলে খুব কষ্ট দিলেন।

আনিস লজ্জিত স্বরে বলল, ভাই কিছু মনে করবেন না।

'না আমি কিছু মনে করিনি।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, আমিও আপনাকে খুব পছন্দ করি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে খানিক সাহায্য করতে পারি।

মনসুর অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে সাহায্য করতে পারেন?'

'হ্যাঁ পারি। আমার মনে হয় আপনার কিছু উপদেশের প্রয়োজন আছে।'

মনসুর তাকিয়ে রইল। আনিস বলল, যে কথাটা আপনি বলতে পারেন না, লজ্জা বোধ করেন বা সংকোচ বোধ করেন সেটা বলে ফেলবেন। পেটে জমিয়ে রাখবেন না। এই হচ্ছে উপদেশ।

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'ধরুন আপনি কাউকে ভালবাসেন। রূপবতী কোন এক তরুণীকে। কিন্তু বলার সাহস পাচ্ছেন না। সব সময়ই আপনার মনে এক ধরণের ভয়। এক ধরনের শংকা। ঐ ভয়, ঐ শংকা দূর করে ফেলুন। যখন মেয়েটিকে একা দেখবেন এগিয়ে যাবেন, সহজ স্বাভাবিক গলায় বলবেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। এতে অতীতে কাজ হয়েছে। বর্তমানে হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে। আমার মনে হয় অনেকদিন থেকেই এ কথাটা আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন। সাহস পাচ্ছেননা।

'আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন?'

'আপনাকে বলছি কারণ আপনি নিতান্তই একজন ভাল মানুষ, আমি আপনার উপকার করতে চাই।'

'আমার উপকার করা নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

মনসুর নীচে নেমে এল কিন্তু আনিসের কথা মাথা থেকে দূর করতে পারল না। ব্যাপারটা তো আসলেই তাই। কাছে যাওয়া এবং এক পর্যায়ে শান্ত গলায় আসল কথাটা বলে ফেলা–

আমি তোমাকে ভালবাসি। I love you.

জগতের সবচে পুরাতন কথা আবার সবচে নতুন কথা। এই কথা বলতে এত সংকোচ কেন? এত দ্বিধা কেন? সে মিলিকে এই কথা বলার পর মিলি কি করতে পারে? সম্ভাবনা গুলি খতিয়ে দেখা যাক।

ক। মিলি মাথা নীচু করে ফেলল। তার ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপছে। চোখের কোণ আদ্র। ক্ষীণ গলায় ছোট্ট করে বলল—তুমি এসব কি বলছ? যাঃ। আমার লজ্জা লাগছে। (মিলি এটা কখনো করবে না। মিলির প্রকৃতি এটা নয়।)

খ। মিলি কড়া চোখে তাকাবে তারপর বলবে, মনে হচ্ছে কয়েক রাত আপনার ঘুম হয়নি। দয়া করে প্রতি রাতে দশ মিলিগ্রাম করে সিডেটিভ খেয়ে ঘুমুবেন। আর যে কথাটা এখন বললেন সেই কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না।
(মিলি এই জাতীয় কিছু বলবে বলেও মনে হয় না। তার হৃদয় এত কঠিন নয়।)

গ। মিলি হো হো করে হেসে উঠবে তারপর যার সঙ্গেই দেখা হবে তাকেই ঘটনাটা বলবে। এই সম্ভাবনাই সবচে বেশী।

খাবার ঘর প্রায় ফাঁকা। রহিমার মা টেবিলে খাবার দিচ্ছে। মিলি বসে আছে একা একা। অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্যে। মনসুর খাবার ঘরে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। মিলিকে কি কথাটা বলে ফেলবে? মন্দ কি? মানসিক যাতনা ভোগ করার চেয়ে হুট করে বলে ফেললেই হয়।

কখন বললে ভাল হবে? খাওয়ার আগে খাওয়ার মাঝখানে নাকি খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর? সবচে ভাল হবে চলে যাবার সময় বললে। মিলি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে তখন সে বলবে সেই বিশেষ কথা। বলেই অপেক্ষা করবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে পগার পার। রাতের টেনশান কমানোর জন্যে দশ—মিলিগ্রাম রিলাক্সেন অবশ্যি খেতে হবে। তাতেও টেনশান কমবে বলে মনে হয় না।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে মনসুর খাবার ঘরে এল। মিলি টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। তাকে লক্ষ্য করল না। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। রহিমার মা পানির জগ বা অন্য কিছু আনতে গেছে। এক্ষুণী হয়ত চলে আসবে। কথাটা বলে ফেললে কেমন হয়? এইতো সুযোগ।

গুছিয়ে কিছু চিন্তা করার আগেই সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মিলি আমি তোমাকে ভালবাসি।

মনসুর বুঝতে পারছে মিলি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। মনসুর তার চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, অনেকদিন থেকেই কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম, বলতে পারছিলাম না। আজ বলে ফেললাম। মিলি আমি তোমাকে ভালবাসি।

'ডাক্তার সাহেব, আমি বিলু। আপনি বসুন। আমি আপনার কথা মিলিকে বলে দেব। মিলি এখানে নেই।'

মনসুরের মনে হল খুব বড় একজন সার্জন, ধারাল ছুরি দিয়ে তার শরীর থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কেটে বের করে নিয়ে গেছে। তার শরীরে এখন কোন বোধ নেই, চেতনা নেই। সে কোন মানুষ না—সে একজন 'জম্বি'। বিলু বলল, 'ডাক্তার সাহেব বসুন।'

মনসুর বসল।

'ঘরে খাবার তেমন কিছু নেই। মিলি কি যেন রাঁধতে গেছে।'

ডাক্তার মাথা নীচু করে বসে রইল। বিলু অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্যে বলল, আপনি এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? এ রকম ছোট খাট ভুলতো মানুষ সব সময় করে। করে না?

মনসুর যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল।

মিলি ডিম ভেজে এনেছে। ঘরে ঢুকেই ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কি হয়েছে?

'কিছু হয় নি।'

মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব আপনার কি হার্ট এ্যাটাক হচ্ছে? এ রকম ঘামছেন কেন?

মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে মিস মিলি। আজ আমি কিছু খাব না।

ডাক্তার কাউকে কিছু বলার অবকাশ দিল না। দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিলি কিছুই বুঝতে পারছে না। হাসতে হাসতে বিলু ভেঙ্গে পড়ছে। তার বড় মজা লাগছে। মিলি বলল, হচ্ছেটা কি আপা? এত হাসি কিসের?

বিলু বলল, ডাক্তার চমৎকার করে প্রেম নিবেদন করল তাই দেখে হাসছি।

'প্রেম নিবেদন করল মানে?'

'ও তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ডুবে মরে যাবার আগে ওকে বিয়ে করে ফেল। ও ভাল ছেলে।'

১৭

দু'জনই দেব শিশু।

দেখে মনে হচ্ছে তারা তাদের ছোট্ট ডানা দু'টি ঘরের বাইরে রেখে খেলতে বসেছে। এই খেলাও অদ্ভুত খেলা। একজনের হাতে একটা কাঁচি, অন্যজন বিছানার চাদর ধরে আছে। কচ কচ করে চাদর কাটা হচ্ছে। বাচ্চা দু'জনের কারো মুখেই কোন বিকার নেই!

পুতুল অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছে। বাচ্চা দু'টিকে সে চেনে তবে এখনো ভাল পরিচয় হয়নি। আজ পরিচয় করার জন্যেই এসেছিল। এসে দেখে এই কান্ড। তার বাধা দেয়া উচিত কিন্তু বাধা দেয়ার পর্যায় পার হয়ে গেছে। বাচ্চা দু'টি বিছানার চাদর কেটেছে, বালিশ কেটেছে একটা লেপ কেটেছে। ঘরময় তুলা উড়ছে। ভয়াবহ অবস্থা।

পুতুল বলল, এইসব কি?

নিশা হালকা গলায় বলল, কিছুনা।

'তোমরা এইসব কেন করতাছ?'

'কাটাকুটি খেলছি।'

বোনের এই কথা টগরের পছন্দ হল না সে বলল, আমরা দরজি দরজি খেলছি।

'দরজি দরজি খেলতাছ?'

'হুঁ।'

বলেই টগর হাসল। অনেকদিন থেকেই এই খেলাটা তার খুব পছন্দ।

রাস্তার ওপাশে নতুন দরজির দোকান হয়েছে–'ক্যালকাটা স্যুটিং' সেখানে খচ খচ করে রাত দিন কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটা হয়, টগর গভীর আগ্রহে দেখে। আজ অনেক দিন পর এই খেলার সুযোগ পাওয়া গেল। কাঁচি অনেক কষ্টে নিশা মিলির কাছ থেকে জোগাড় করেছে।

পুতুল বলল, তোমাদের আব্বা তোমাদের মারবে না?

টগর বলল, মারবে।

'তারপরেও এই রকম করতাছ?'

'হুঁ।

'কেন?'

নিশা ছোট্ট করে হেসে বলল, বেশি মারবে না। অল্প মারবে।

'অল্প মারবে কেন?'

'আমাদের মা মারা গেছেতো। মা মারা গেলে বাচ্চাদের বেশি মারার নিয়ম থাকে না। কম মারতে হয়।'

পুতুল বলল, অনেক খেলা হইছে এখন হাত থাইক্যা কেচিটা নামাও। না হইলে হাত কাটব।

টগর বলল, আপনি এখন যানতো। আপনি আমাদের বিরক্ত করবেন না। পুতুল নড়ল না। এমন মজার একটি দৃশ্যের আকর্ষণ এড়িয়ে সে যেতে পারছে না। বাচ্চা দু'টি টুক টুক করে কথা বলছে।

নিশা বলল, আপনি আমার জন্যে এক গ্লাস খাওয়ার পানি আনেন তো। এমনভাবে বলল যেন কতদিনের পরিচিত। কত দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা। পুতুল পানি আনতে গেল।

পানি এনে দুই দরজীর কাউকেই পাওয়া গেল না। তারা অদৃশ্য। ডেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আনিস ঘরে এসেছে। তার সাড়া পাওয়ার পরই এই অবস্থা।

পুতুল আনিসকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, স্লামালিকুম।

আনিস বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি এমদাদ সাহেবের নাতনী তাই না? পুতুল তোমার নাম?

'জ্বি।'

'দেখেছ কি অবস্থা?'

পুতুল কিছু না বলে মুখ নীচু করে হাসল। আনিস বলল, এদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি। এরা যা করছে তার নাম দুষ্টুমী না। এ হচ্ছে ইচ্ছা করে আমাকে কষ্ট দেয়া। তোমার পানির গ্লাসটা কি আমাকে দিতে পার?

পুতুল গ্লাস এগিয়ে দিল। আনিস এক চুমুকে পানি খেয়ে ফেলল। বিষন্ন গলায় বলল, এই ঘটনা কিন্তু আজ নতুন ঘটছে না। এটা পুরনো ঘটনা। আগেও কাটাকুটি খেলা একবার হয়েছে। তখন তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনদিন খেলবে না। বার বার তো এটা হতে দেয়া যায় না।

পুতুল বলল, বাদ দেন। এরা ছোট মানুষ।

'তুমি ভুল বলছ পুতুল–ওরা ছোট হলেও আমার সঙ্গে যা শুরু করেছে তা বড় মানুষদের খেলা। এক ধরনের দাবা খেলা। তারা একরকম চাল দিচ্ছে আমি এক রকম চাল দিচ্ছি। আমার সংসার টিকে থাকবে কি থাকবে না এটা নির্ভর করছে এই খেলায় জয় পরাজয়ের উপর।'

এই মানুষটার কথা গুলি পুতুলের বড় ভাল লাগছে। কি সহজ সরল ভঙ্গিতেই না পুতুলের সঙ্গে সে কথা বলছে। যেন পুতুল তার কত দীর্ঘদিনের চেনা মানুষ অথচ এর আগে একদিন মাত্র কথা হয়েছে। তাও–কি নাম? দেশ কোথায়? এ রকম কথা।

'পুতুল।'

'জ্বি।'

'ওরা কোথায় পালিয়েছে তোমার কোন ধারণা আছে?'

'জ্বি না।'

'আচ্ছা ওদের খুঁজে বের করছি, তার আগে এসো আমরা দু'জন এক কাপ করে চা খাই। না কি তুমি চা খাও না?'

'খাই।'

'তাহলে বরং চা বানাও। চা খাবার পর ঠিক করব টগর এবং নিশাকে কি শাস্তি দেয়া যায়।'

কত সহজ কত আন্তরিক ভাবেই না লোকটা কথা বলছে, শুনতে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে তারা সবাই একই ছাদের নিচে দীর্ঘদিন ধরে আছে, যে ছাদের উপর ঝড়ে পড়েছে কত বৃষ্টি কত জ্যোৎস্না।

চা বানানোর কেরোসিন কুকার ঘরের এক কোণেই আছে। কেরোসিন কুকার ধরাতে অসুবিধা হল না। চা বানাতে বানাতে ছোট ছোট সব কথা হতে লাগল। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব আনিস খুব মমতার সঙ্গে দিল। যেমন পুতুল বলল, ভাইজান আফনে কি করেন?

আনিস হাসতে হাসতে বলল, আমি কিছুই করিনা, আবার অনেক কিছুই করি।

'সেইটা কেমুন?'

'আমি লিখি। একজন লেখককে দেখলে কখনো মনে হবে না সে বিশেষ কিছু করছে। হাতে হেলাফেলা করে ধরা একটা কাগজ। একটা কলম বা পেন্সিল। একজন শ্রমিককে বিশাল এক খন্ড পাথর উপড়ে তুলতে কত না পরিশ্রম করতে হয়। টপ টপ করে তার মাথা বেয়ে ঘাম পড়ে অথচ একজন লেখককে দেখবে কত অনায়াসে লিখছে–অপূর্ব সব লেখা। এইসব লেখা কি তুমি কখনো পড়েছ?'

পুতুলের কথা শুনতেই ভাল লাগছে, জবাব দিতে ইচ্ছা করছে না। ওদিকের মানুষটি বোধ হয় তা বুঝতে পারছে। সে বলছে–দেখ পুতুল লেখালেখি কি অদ্ভুত জিনিস মাত্র চার লাইনের একটা কবিতা, মাত্র দু'লাইনের দু'টি বাক্যে ধরা দিতে পারে মহান কোন বোধ, জীবনের গভীর ক্রন্দন।

পুতুল চুপি চুপি বলল, একটা বলবেন?

'হ্যাঁ বলব। আমি টগর ও নিশাকে প্রায়ই বলি। তুমি যদি আস তুমিও শুনবে। আজ না আজ থাক। আজ আমার মনটা খারাপ। বাচ্চা দু'টি বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। কি চাচ্ছে কিচ্ছু বুঝতেও পারছি না। পুতুল।

'জ্বি।'

'তুমি কি আমাকে আরেক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবে?'

কত সামান্য কথা অথচ পুতুলের এত ভাল লাগল। তার ইচ্ছা করছে আনন্দে একটু কাঁদে। তার কেন এত আনন্দ হল? এই আনন্দের উৎস কোথায়? এইত চোখ ভিজে উঠছে। কেন, চোখ ভিজে উঠল কেন?

টগর ও নিশা বিলুর পেছনে পেছনে রাত দশটায় শোবার ঘরে ঢুকল এবং কোনদিকে না তাকিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তাদের চোখ বন্ধ। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন ঘুমিয়ে কাদা! বিলু বলল, আনিস সাহেব দয়া করে এবারের মত বাচ্চাদের ক্ষমা করে দিন। ওরা যা করেছে তার জন্যে খুব লজ্জিত, দুঃখিত এবং অনুতপ্ত! ভয়ে এ ঘরে আসতে চাচ্ছিল না। আমি অভয় দিয়ে নিয়ে এসেছি।

আনিস বলল, থ্যাংকস।

'ওরা আমাকে কথা দিয়েছে আর কোনদিন এরকম করবে না।'

'এই কথা, কথা পর্যন্তই! ওরা আবারো এ রকম করবে এবং আপনার মতো অন্য কাউকে ধরে নিয়ে আসবে যাতে ক্ষমা করা হয়। কাজেই এবার ক্ষমার প্রশ্নই উঠে না।'

বিলু অবাক হয়ে বলল, 'আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি তারপরেও আপনি ক্ষমা করবেন না? তারপরেও এরকম কঠিন করে কথা বলছেন?

'হ্যাঁ বলছি। কারণ আপনার আগে আপনার বাবা এদের একবার নিয়ে এসেছেন, আপনার মা নিয়ে এসেছেন, মিলি এনেছে। একবার কাদের এদের প্রটেকসন দিয়ে এনেছে।'

বিলু কঠিন স্বরে বলল, অর্থাৎ আপনি ওদের শাস্তি দেবেন?

'হ্যাঁ।'

'কি শাস্তি জানতে পারি?'

'ওরা জানে কি শাস্তি। ওদেরকে আমি বলে রেখেছি– যে, আবার যদি তারা কাটাকুটি খেলা খেলে তাহলে ওদের ফেলে রেখে আমি চলে যাব।'

'আপনি ওদের ফেলে রেখে চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ চলে যান। আপনার সংসার আপনি চালাবেন। যেভাবে চললে ভাল হয় সে ভাবে চালাবেন।'

আনিস রাত ১১টা দশ মিনিটে ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। বিলু সারাক্ষণই ভাবছিল এটা এক ধরণের ঠাট্টা হয়ত গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবে। দেখা গেল ব্যাপার মোটেই ঠাট্টা না। আনিস সত্যি সত্যি চলে গেছে।

১৮

এমদাদ বলল, ভাইসাব এখন তাহলে উঠি? এগারোটার উপরে বাজে। সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আমার লেখাটা পছন্দ হচ্ছে না?

এমদাদ চোখ বড় বড় করে বলল, পছন্দ হচ্ছে না এইটা ভাইসাব কি বললেন। জীবনের সার কথা তো সবটাই আপনার লেখার মধ্যে। ক্ষুধা বিষয়টা যে কি আপনের লেখা পড়ার আগে জানতাম না। উপাষ দিছি ঠিকই কিন্তু ক্ষুধা বুঝি নাই। এখন বুঝলাম।

সোবাহান সাহেব বললেন, তাহলে কি বাকিটা পড়ব?

'অবশ্যই পড়বেন।'

'দেড়শ পৃষ্ঠার মত লেখা হয়েছে আমি ভাবছি আরো শ' দুই পৃষ্ঠা লিখে ফেলব। মোটামুটি সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার একটা কাজ।'

'ভাইসাব টেনে টুনে এটারে পাঁচশ করেন। একটা কাজ যখন হইতেছে ভাল করেই হোক।'

'পড়তে শুরু করি তাহলে?'

'আলহামদুলিল্লাহ।'

এমদাদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে চেয়ারে পা তুলে বসল। গত দু'ঘন্টা যাবত এই জিনিষ শুনতে হচ্ছে। এখন মাথা ঘুরছে ভন ভন করে অথচ বলতে হচ্ছে অসাধারণ। এর নাম কপাল।

'এমদাদ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনি যদি কোন পয়েন্টে আমার সঙ্গে ডিফার করেন তাহলে দয়া করে বলে ফেলবেন। সংকোচ করবেন না। আমি নোট রাখব। কারণ বইটা অনেকবার রিরাইট করতে হবে। শুরু করি তাহলে?'

'জ্বি আচ্ছা।'

সোবাহান সাহেব শুরু করলেন,

আমি ক্ষুধা সম্পর্কে প্রচুর উক্তি সংগ্রহ করিয়াছি। আগে জানিতে চাহিয়াছি অন্যে ক্ষুধা প্রসঙ্গে কি ভাবিয়াছেন। তাহাদের ভাবনা আপাতত অত্যন্ত মনকাড়া হইলেও আমার কাছে কেন জানি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। ক্ষুধা নিয়া বড় বড় মানুষ রঙ্গ রসিকতা করিয়াছেন মূল ধরিতে পারেন নাই। যেমন ফ্রাংকলিন বলিয়াছেন, না খেয়ে মানুষকে মরতে দেখেছি খুবই কম, অতিরিক্ত খেয়ে মরতে দেখেছি অনেককে।

ইহাকে আমি রসিকতা ছাড়া আর কি বলিব?

উইল রজার বলিয়াছেন–ক্ষুধার্তরা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের চেয়েও ধারালো।

ইহাও কি একটি সুন্দর মিথ্যা নয়? ক্ষুধার্তরা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত ধারালো হইলে দেশে বিপ্লব হইয়া যাইত। তাহা হয় নাই। -- - --

'এমদাদ সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়লেন না–কি?'

'জ্বি না! এই চোখ বন্ধ করে আছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, চউখটা বন্ধ থাকলে শুনতে ভাল লাগে।'

'ঠিক বলছেন– আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে–ক্ষুধা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মানুষদের ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনা সঠিক ছিল না। ক্ষুধার ভয়াবহ রূপ তাঁরা ধরতে পারেননি। তবে সবাই যে পারেন নি তা না। যাঁরা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকেছেন। অভুক্ত থেকেছেন তারা পেরেছেন। যেমন ইংল্যান্ডের চার্লস ডিকেন্স এবং রাশিয়ার ম্যাক্সিম গর্কি। হ্যাংগার বা ক্ষুধা নামক একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে নুট হামসুনের লেখা। সেই বইটিতেও ক্ষুধার ভয়াবহ বর্ণনা আছে। যদিও সেই বর্ণনা আমার কাছে যথাযথ মনে হয়নি। এমদাদ সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন না–কি?'

'জ্বি না।'

'মনে হচ্ছিল নাক ডাকের মত শব্দ হচ্ছে।'

'জনাব এইটা হইল আমার অভ্যাস। খুব চিন্তাযুক্ত হইয়া যদি কিছু শুনি তখন এই রকম শব্দ হয়।'

'আজ না হয় থাক। অন্য আরেকদিন পড়ব।'

এমদাদ উঠতে উঠতে বলল, এইসব আসলে আমাদের শুনায়ে কোন লাভ নাই। আমরা আছিইবা কয়দিন। এইসব শোনা দরকার অল্প বয়স্ক পুলাপানদের। যেমন ধরেন এই বাড়ির ফরিদ, তারপর ধরেন ডাক্তার। সোবাহান সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন,

'কথাটা ভুল বলেন নি। ডাক্তার অনেকদিন আসছেও না–আচ্ছা দেখি কাল খবর পাঠাব।'

এমদাদ হাঁপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘন্টার পর ঘন্টা ক্ষুধা বিষয়ে পড়ার চেয়ে ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে মরে যাওয়া ভাল।

'ভাইসাব তাহলে যাই–স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। কাল দুপুর থেকে বসে যাব। বাকিটা একটানে পড়ব কেমন'

এমদাদ শুকনো গলায় বললেন, জ্বি আচ্ছা।

রাতে মশারী ফেলতে এসে মিনি বলল, বাবা আনিস সাহেব যে পালিয়ে গেছেন সেই খবরটা কি শুনেছ?

সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, পালিয়ে গেছে মানে?

'বাচ্চা দু'টিকে রেখে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়েছেন।'

'কারণটা কি?'

'বাচ্চারা তার কথা শুনে না। তিনি বাচ্চা দু'টিকে শিক্ষা দিতে চান।'

'ওরা কান্না কাটি করছে না?'

'না ওরা সুখেই আছে। বিলু আপার সঙ্গে শুয়েছে। বিলু আপা ক্রমাগত কবিতা আবৃত্তি করছে ওরা শুনছে। এত রাত হয়েছে অথচ ঘুমুবার কোন লক্ষণ নেই।'

'বাচ্চা দু'টি তাহলে ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ। এবং মনে হচ্ছে এই নাটকীয় ঘটনায় তারা বেশ আনন্দিত।'

সোবাহান সাহেব অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে পড়লেন। মিলি খুব হালকা গলায় বলল, বাবা বিলু আপা বাচ্চা দু'টিকে যে কি রকম পছন্দ করে তা কি তুমি জান?

'না জানি না।'

'অতিরিক্ত রকমের পছন্দ। এর ফল ভাল নাও হতে পারে বাবা।'

'ফল ভাল হবে না কেন?'

'সব কিছু আমি তোমাকে গুছিয়ে বলতে পারব না। আমার লজ্জা লাগবে। শুধু এইটুকু বলি ছোট মেয়েটি বিলু আপাকে আড়ালে ডাকে –'আম্মি।'

'তাতে অসুবিধা কি? আমরাতো অনেকেই মা ডাকি।'

'তা ডাকি। তবে আড়ালে ডাকি না–এই মেয়েটা ডাকছে আড়ালে।'

'ও।'

'এই নাও বাবা তোমার রিলাক্সিন। খেয়ে ঘুমাও।'

'বিলুকে একটু ডেকে আনতো কথা বলি।'

'আজ থাক বাবা। আজ বিলু আপা ওদের কবিতা শোনাচ্ছে।'

'মিলি।'

'জ্বি।'

'ঐ ডাক্তার অনেকদিন আসছে না ব্যাপারটা কি?'

মিলি ঈষৎ লাল হয়ে বলল, আমি জানি না কেন আসছে না।।

'ওকে খবর পাঠাস তো।'

মিলি আরো লাল হয়ে বলল, খবর পাঠাতে হবে না। ও এম্নিতেই আসবে।

সোবাহান সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললেন, ডাক্তার ছেলেটা ভাল। মিলি থমথমে গলায় বলল, বার বার তার প্রসঙ্গ আসছে কেন বাবা?

'ওকে ক্ষুধা বিষয়ক রচনাটা পড়ে শুনাতে চাই। খবর দিবিতো।'

'আচ্ছা দেব।'

'গোপনে গোপনে আম্মি ডাকছে। এটাও চিন্তার বিষয়।'

'তোমাকে এত চিন্তা করতে হবে না।'

'তোর মা এখন আমার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে না। আলাদা ঘুমুচ্ছে এই বিষয়টা কি বলতো?'

'জানি না বাবা, এটা তোমাদের ব্যাপার তোমরা ফয়সালা করবে। আমি এখন যাচ্ছি। আর কিচ্ছু তোমার লাগবে?'

'না। খাওয়ার পানি দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'যাবার আগে ক্ষুধা সম্পর্কে লাষ্ট যে পাতাটা লিখলাম সেটা কি পড়ব, শুনবি?'

'রক্ষা কর বাবা। ক্ষুধা সম্পর্কে জানার আমার কোন আগ্রহ নেই। তুমি জেনেছ এইতো যথেষ্ট। একটা ফ্যামিলি থেকে একজন জানাই কি অনেক জানা না? ফ্যামিলির সব মেম্বারদের জানতে হবে?'

'হ্যাঁ হবে। আমি এই জিনিসটা তোর মা'কে বুঝাতে পারি না।'

'বাবা তুমি ঘুমাও তো—'

টগর এবং নিশা জেগে আছে। জেগে আছে বিলু। সে পড়ছে দেবতার গ্রাস। খুব সহজ কোন কবিতা না কিন্তু টগর এবং নিশা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। টগরের চোখে জল। একটু পর পর তার ঠোঁট কেঁপে উঠছে। বিলু অবাক হয়েছে। একটা বাচ্চা ছেলের মধ্যে এত আবেগ। আশ্চর্য তো!

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা–
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, ''বাছা কোথা যাবি ওরে!
রাখাল কহিল হাসি, চলিনু সাগরে।
আবার ফিরিব মাসি!'' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছাড়া বেশিক্ষণ থাকেনি কোথাও। —'

পড়া এইটুকু আসতেই টগর বিলুকে হতভম্ব করে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নিশাও ঘন ঘন চোখ মুছছে।

বিস্মিত বিলু বলল, এ রকম কাঁদার তো কিছু হয়নি। কাঁদছ কেন টগর? টগর কিছু বলল না। নিশা বলল, টগর এমন করে কাঁদছে কারণ আমাদের আম্মু এই কবিতা আমাদের শুনাতো। আম্মু বই পড়ে বলতো না। পুরোটা মুখস্ত বলতো।

বিলু বলল, এটা ছাড়া আর কোন কবিতা তিনি বলতেন?

'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটাও বলতেন।'

'ঐটাও অবিশ্যি খুব সুন্দর।'

টগর লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, এই কবিতাটা আম্মু বলতো নেচে নেচে। বিলু অবাক হয়ে বলল, 'নেচে নেচে মানে?'

'হাত পা দুলিয়ে নাচত। নেচে নেচে বলত।'

'বাহ চমৎকারতো। তোমাদের তো দেখছি অদ্ভুত একটা মা ছিল।'

'হ্যাঁ ছিল।'

সেই রাতে বাকি কবিতাটা আর পড়া হল না।

রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছে আনিস। খারাপ লাগছে না। ভালই লাগছে। বিয়ের আগে এইভাবে হেঁটে হেঁটে কত রাত সে পার করে দিয়েছে। রাতের ঢাকায় কত কি দেখার আছে। রূপহীনা কিছু তরুণী কেমন মাছের মত চোখে তাকায় চলমান পুরুষদের দিকে। যদি কেউ তাকে পছন্দ করে। যদি কেউ এগিয়ে আসে। অর্থ দিয়ে অল্প কিছু আনন্দ যদি কিনে নিতে চায়। সৃষ্টির কোন এক লগ্নে বিধাতা শরীর দিয়ে মানব এবং মানবী পাঠিয়েছিলেন। সেই শরীরে বপন করেছেন

ব্যাখ্যাতিত ভালবাসা। সেই ভালবাসার একটি কদর্য অংশ টাকায় কেনা যায়। আনিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কেমন অকাতরে মানুষজন ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ জেগে উঠে বিড়ি ধরিয়ে পাশের মানুষের সঙ্গে গল্প করছে। এদের দেখে মনে হচ্ছে এরা কত না সুখী।

আনন্দিত হবার অসাধারণ ক্ষমতা এই মানুষের। আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখলে এরা খুশী হয়। একটি অবোধ শিশুকে হেসে ফেলতে দেখলে এরা খুশী হয়। আমগাছ যখন নতুন পাতা ছাড়ে তখন তাই দেখেও আনন্দে অভিভূত হয়। মানুষ প্রকৃতির এত চমৎকার একটি সৃষ্টি প্রকৃতি তবু নানান শিকলে তাকে বাঁধলেন। ক্ষুধার শিকল, তৃষ্ণার শিকল -- প্রকৃতির নিশ্চয়ই তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন মানুষ নামক এই প্রাণীটাকে নানান দিক থেকে বেঁধে না রাখলে সে শেষ পর্যন্ত একটা ভয়াবহ কান্ড করে বসবে। স্বর্গ মর্ত পাতাল জয় করবে–গ্রহ থেকে গ্রহান্তরকে সে নিয়ে আসবে তার পায়ের নীচে এবং এক সময় প্রকৃতিকেই প্রশ্ন করে বসবে– কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? কি চাও তুমি মানুষের কাছে? কেন তুমি আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছ? কোথায় তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও?

আনিস সিগারেট ধরিয়ে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের দিকে রওনা হল। আজকের রাতটা সে লঞ্চ টার্মিনালেই কাটাবে।

'স্যার।'

আনিস চমকে তাকাল।

'মেয়ে লাগব স্যার? কলেজ গার্ল। বিশ্বাস না করলে সার্টিফিকেট দেখবেন।'

'কি নাম মেয়ের?'

'মেয়ে তো একটা না। অনেক আছে। নাম দিয়া কি হইবে? কি রকম চান বলেন। হোটেলে ব্যবস্থা করা আছে। কোন সমস্যা না।'

আনিস হাসি মুখে বলল, এমন কোন মেয়ে যদি আপনার সন্ধানে থাকে যার নাম রাত্রি তাহলে যেতে পারি। আমার স্ত্রীর ভাল নাম রেশমা, ডাক নাম–'রাত্রি'। এই নামের কাউকে পাওয়া গেলে খানিকক্ষণ গল্প করতাম।

লোকটি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। রাতের ঢাকায় হেঁটে বেড়ানোর এই হচ্ছে এক সমস্যা –কিছুক্ষণ পর পর দালালদের হাতে পড়তে হয়।

আনিসের মাথায় চট করে কবিতার একটা লাইন চলে এল–'কিছু ভালবাসা কিনিব অল্প দামে।'

কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে প্রথম লাইনটিই শুধু এসেছে। দ্বিতীয় লাইনটি আর আসবে না। প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে রসিকতা করতে বড্ড পছন্দ করে। একটা অসাধারণ লাইন পাঠায়। দ্বিতীয় লাইনটা আর পাঠায় না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দ্বিতীয় লাইনটার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। যা আর আসে না।

আচ্ছা রাত্রির মত দ্বিতীয় কোন তরুণী কি আসবে তার জীবনে? যে গভীর রাতে হঠাৎ অকারণ পুলকে মাথার লম্বা চুল খোঁপা করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাজবে। বাতি নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে মদির গলায় বলবে এখন আমি নাচব। তুমি বসে বসে দেখবে–

''সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা।
চলিল কুসুম কাননে।
কৌতুকরসে পাগলপরাণী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রাণী

কহে সহাস্য আননে–
ওগো দে'বা আয়, ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে।"

না রাত্রির মত মেয়েরা বার বার আসে না। এদের হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়। অসীম সৌভাগ্যবান কোন পুরুষ হঠাৎ এদের পেয়ে যান। সে যেমন পেয়েছিল। রাত্রির মৃত্যুর সময় সে তার হাতে হাত রেখে বসেছিল। এক সময় আনিস বলল, কষ্ট হচ্ছে?

রাত্রি বলল, হ্যাঁ।

আনিস সহজভাবে বলল, কষ্টের কিছু নেই রাত্রি আবার দেখা হবে। রাত্রি চোখের পানি মুছে বলল, এই কথাটা ভুল। আর দেখা হবে না। যা দেখার এই বেলা দেখে নাও।

পরকাল আছে কি না এটা নিয়ে আনিস মাথা ঘামায় না তবে আর কোনদিন দেখা হবে না এই কথা আনিস গ্রহণ করেনি। দেখা হয়েছে। রাত্রির সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। অন্য একটি মেয়ে হঠাৎ হয়ত অবিকল রাত্রির মত করে হাসল। আবার দেখা হল রাত্রির সঙ্গে।

বিটের দু'জন পুলিশ আনিসকে থামাল।

'আপনি কে?'

'আমার নাম আনিস?'

'যান কোথায়?'

আনিস চুপ করে রইল। বিটের পুলিশ বিরক্ত হয়ে তাকাচ্ছে। রাতের শহরে বিটের পুলিশরাও বড় বিরক্ত করে।

'কথা বলেন না কেন? যান কোথায়?'

'কোথাও যাই না–হাঁটি।'

'দেখি আপনার ঝুলির মধ্যে কি আছে?'

ঝুলির মধ্যে তেমন কিছু পাওয়া গেল না–স্কট মমাডের লেখা একটি উপন্যাস House made of down আনিসের জন্মদিনে রাত্রি উপহার দিয়েছিল। গোটা গোটা হরফে লেখা– "আনিস, তুমি এত ভাল কেন?"

আনিস বিটের পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বইটি আমার স্ত্রী আমার জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন। এইখানে আমার প্রসঙ্গে কি লেখা আছে আপনি পড়ে দেখতে পারেন। আমার স্ত্রীর ধারণা আমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। মেয়েরা অবশ্যি সব সময়ই একটু বাড়িয়ে কথা বলে। তবু --'

পুলিশ আনিসকে ঘাঁটাল না। এগিয়ে গেল। এরকম নিশি পাগলের সঙ্গে তাদের সব সময় দেখা হয়। এদের নিয়ে মাথা ঘামালে তাদের চলে না।

১৯

মনসুর সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে।

সোবাহান সাহেবের কারণেই সে এমনভাবে বসা। সোবাহান সাহেব চান যে সে আরাম করে বসে ক্ষুধা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার লেখাটা শুনে। মনসুর একবার শুধু ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার লেখাটা কত পৃষ্ঠা?

সোবাহান সাহেব বললেন, তিন শ' বাইশ পৃষ্ঠা হয়েছে। এখনো লিখছি। আরো বাড়বে। মনসুর হতভম্ব হয়ে বলল, 'সবটা আজ শুনাবেন?'

'হ্যাঁ। নয়তো ফ্লো ঠিক থাকে না। ফ্লো থাকাটা খুব দরকার। একসঙ্গে না শুনলে তুমি পরিস্কার বুঝতে পারবে না।'

'তা ঠিক।'

'তুমি আরাম করে পা তুলে বস। খুব মন দিয়ে শুনবে। কিচ্ছু মিস করবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর পড়ার সময় হু হা এইসব কিচ্ছু বলবে না। এতে আমার অসুবিধা হয়। কনসানট্রেসান কেটে যায়।'

'আমি কিছু বলব না।'

'ভেরী গুড।'

সোবাহান সাহেব শুরু করলেন এবং অতি দ্রুত পড়ে যেতে লাগলেন। ঘন্টা খানিক পার হবার আগেই ঘরে ঢুকল ফরিদ। সোবাহান সাহেবকে থামিয়ে বলল, দুলাভাই আপনার কাইন্ড পারমিশান নিয়ে কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

'কি কথা?'

'যাকে আপনি লেখা পড়ে শুনাচ্ছেন সেই গাধা ঘুমুচ্ছে। তাকিয়ে দেখুন- হা করে ঘুমুচ্ছে।'

সোবাহান সাহেব তাকালেন এবং তাঁর মন সত্যি সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেল। আসলে তাই। ডাক্তার ঘুমুচ্ছে। হা করেই ঘুমুচ্ছে।

সোবাহান সাহেব উচ্চস্বরে ডাকলেন, মিলি মিলি। সেই শব্দেও ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গল না। কয়েকবার শুধু ঠোঁট কাঁপল। মিলি পাশে এসে দাঁড়াবার পর সোবাহান সাহেব বললেন, ডাক্তারের মাথার নীচে একটা বালিশ দাও মা ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষুধা বিষয়ক আমার এই জটিল লেখা পড়তে পড়তে যে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারে এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মিলি ডাক্তারের মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়ে দিল। পাতলা চাদরে গা ঢেকে দিল। এই সামান্য কাজটা করতে তার ভাল লাগল। প্রবল ইচ্ছা করতে লাগল এই ছেলেটার হাতটা একটু ছুঁয়ে দেখতে। মানুষের মনে কেন এরকম ইচ্ছা হয়? এই ইচ্ছার নামই কি ভালবাসা? তাহলে ভালবাসা ব্যাপারটা কি শরীর নির্ভর? কবি যে বলেন- প্রতি অঙ্গ লাগি তার প্রতি অঙ্গ কাঁদেরে-এই কথা কি সত্যি? সত্যি হলে খুব কষ্টের ব্যাপার হবে। ভালবাসার মত এত বড় একটা ব্যাপারকে দেহে সীমাবদ্ধ করা খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়। তবু কেন জানি ভালবাসা শেষ পর্যন্ত দেহেই আশ্রয় করে। বড় রহস্যময় এই পৃথিবী। বড়ই রহস্যময়।

মিলি গায়ে চাদর দিয়ে দিচ্ছে পাশে মুখ বিকৃত করে দাঁড়িয়ে আছে ফরিদ। সে বলল, এত বড় গাধা আমি আমার লাইফে দেখিনিরে মিলি। একটা ভদ্রলোক আগ্রহ করে তোকে একটা লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন আর তুই ব্যাটা ঘুমিয়ে পড়লি? তোর একটু লজ্জাও লাগল না? আবার দেখনা নাক ডাকাচ্ছে। কষে একটা চড় দেব না-কি?

মিলি বলল, বেচারাকে ঘুমুতে দাও মামা বিরক্ত কর না।

'আমার কি ইচ্ছা করছে জানিস? আমার ইচ্ছা করছে গাধাটাকে ধরাধরি করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে একটা শক খাবে। বুঝবে কত ধানে কত চাল।'

'তুমি এ ঘর থেকে যাও তো মামা।'

ঘরে প্রচন্ড মশা। বেচারাকে মশা বিরক্ত করছে। সোফার উপর মশারী খাটিয়ে দেয়া যায় না। মিলি মসকুইটো কয়েল জ্বালিয়ে দিল।

রাতে ভাত খেতে খেতে সোবাহান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার কি এখনো ঘুমুচ্ছে? মিলি লজ্জিত গলায় বলল, হ্যাঁ বাবা।

সোবাহান সাহেব বিস্মিত স্বরে বললেন, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। ফরিদ বলল, দুলাভাই আমার ধারণা আপনার ক্ষুধা বিষয়ক বইটাতে ঘুম উদ্রেককারী কিছু একটা আছে। আপনি যখন ডাক্তার ব্যাটাকে পড়ে শুনাচ্ছিলেন তখন আমিও দু'তিন পৃষ্ঠা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। আমার তিনবার হাই উঠল।

সোবাহান সাহেব কঠিন চোখে তাকালেন, কিছু বললেন না।

ফরিদ বলল, ইনসমনিয়ার ওষুধ হিসেবে এই বই বাজারে ছাড়া যেতে পারে। আমি ঠাট্টা করছি না দুলাভাই। আমি ড্যাম সিরিয়াস।

বিলু বলল, চুপ করতো মামা।

'চুপ কর, চুপ কর এই কথা ইদানীং আমাকে খুব বেশী শুনতে হচ্ছে। আমার এটা শুনতে ভাল লাগছে না। সব মানুষেরই কিছু ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে। এবং সেই মতামত প্রকাশের অধিকারও তার থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। দুলাভাইয়ের বইটি পড়ে আমার ঘুম আসছে এটা বলে দুলাভাইয়ের বইয়ের প্রতি আমি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি না। বইটির নতুন একটি ডাইমেনসনের দিকে আমি ইংগীত করছি।

মিনু বললেন, আর একটা কথা বললে এই ভাতের চামচ দিয়ে তোর মাথায় একটা বাড়ি দেব।'

'তা দাও। তবু আমার কথাটা আমি বলবই। সক্রেটিস 'ন্যায় কি' এ কথাটা বোঝাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাকে হেমলক নামের তীব্র হলাহল পান করতে হল। আমি ক্ষুধা এবং ঘুমের সম্পর্ক বলতে গিয়ে না হয় চামচের একটা বাড়ি খেলামই।'

সোবাহান সাহেব শান্ত গলায় বললেন, খাওয়া দাওয়ার পর তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ফরিদ। ফরিদ বলল, জ্বি আচ্ছা।

'কথাগুলি অপ্রিয়। তবু আমি ঠিক করেছি কথাগুলি তোমাকে বলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আনিস ছোকরা কি এখনো আসেনি?'

বিলু বলল, না আসেনি।

'কোথায় আছে? কোন খবর পাঠিয়েছে?'

'না।'

'ওকে যেন আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেয়া না হয়। যে মানুষ তার দু'টি বাচ্চা ফেলে উধাও হয়ে যায় তাকে এ বাড়িতে আমি থাকতে দিতে পারি না।'

ফরিদ বলল, আপনার এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি দুলাভাই।

'তোমার সমর্থনের আমি কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'প্রয়োজন বোধ না করলেও সমর্থন করছি। আপনি বোধহয় জানেন না দুলাভাই যে সত্য এবং ন্যায়ের পেছনে আমি সদা সর্বদা হিমালয়ের পর্বতের মতই দাঁড়াই। I stand as a rock'

'তোমার কি খাওয়া শেষ হয়েছে ফরিদ?'

'জ্বি না। এখন একবাটি ডাল খাব। খাওয়া দাওয়ার পর আমি একবাটি ডাল খাই। ভেজিটেবল প্রোটিন। এটার খুবই দরকার।'

'ডাল খাওয়া শেষ হবার পর তুমি দয়া করে আমার ঘরে এসো। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

সোবাহান সাহেব নিতান্তই অনুত্তেজিত স্বরে যে সব কথা বললেন, সেগুলি হচ্ছে, ফরিদ আমার ব্লাড প্রেসার হচ্ছে একশ ষাট বাই পঁচানব্বই। আমার বয়সে এটাই স্বাভাবিক। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়।'

'কতটা বাড়ে তা কি জানতে পারি?'

'এ পর্যন্ত দু'বার মেপেছি। দেখেছি উপরেরটা হয় দু'শ নিচেরটা এক'শ দশ।

'বলেন কি কোয়ায়েট ইন্টারেস্টিং।'

'তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে! আমার কাছে ইন্টারেস্টিং নয়। আমি চাই তুমি যেন আর কখনো আমার সামনে না আস।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'আমার শ্বশুর সাহেব তোমার নামে আলাদা করে কিছু টাকা আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। এই টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। সেই টাকায় বাড়ি টারি কিনে তুমি মোটামুটি রাজার হালে থাকতে পার।'

ফরিদ আগ্রহী গলায় বলল, 'অনেক টাকা না-কি?'

'হ্যা অনেক টাকা। তবে তোমাকে আমি টাকাটা দিতে পারছি না। কারণ শ্বশুর সাহেব বলেছেন তোমার মাথাটা ঠিক না হলে যেন তোমার কাছে টাকা না দেয়া হয়। তোমার মাথা ঠিক না।

'আমার মাথা ঠিক না?'

'না।'

'আর আপনারটা হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক?'

'আমার মাথা নিয়ে কথা হচ্ছে না। তোমারটা নিয়ে কথা হচ্ছে।'

ফরিদ হঠাৎ দাঁড়াল। গাঢ় গলায় বলল, দুলাভাই আমি চললাম। আমার কারণে আপনার প্রেসার বাড়বে না।

মনে হচ্ছে ফরিদের নিজের ব্লাড প্রেসারও হু হু করে বাড়ছে। মাথার ভেতর প্রলয় কান্ড ঘটে যাচ্ছে। মনে হয় এই অবস্থাতেই কবি নজরুল লিখেছিলেন–

"আমি ভরা তরী করি ভরা ডুবি, আমি টর্নেডো, আমি ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত, বিশ্ব বিধাত্রীর।"

ফরিদের রাগ অনুরাগ কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না বলে নিজের ঘরে যেতে যেতে নিজেকে অনেকটা সামলে ফেলল। বসার ঘরের সোফায় ডাক্তার হা করে ঘুমুচ্ছে। ব্যাটাকে কষে একটা চড় দেবার ইচ্ছা অনেক কষ্টে দমন করতে হল। চড়টা দিতে পারলে রাগটা পুরোপুরি চলে যেত। রাগ কমানোর অনেকগুলি পদ্ধতির মধ্যে একটি হচ্ছে অন্যের উপর রাগ ঢেলে দেয়া। কিংবা উল্টো দিক থেকে সংখ্যা গোনা-একশ, নিরানব্বই, আটানব্বই, সাতানব্বই, ছিয়ানব্বই· ফরিদ সংখ্যা পদ্ধতি চেষ্টা করল। পদ্ধতি আজ কাজ করছে না। সব দিন সব পদ্ধতি কাজ করে না। চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ডাক্তার ব্যাটাকে সোফা থেকে ফেলে দিলে কেমন হয়, ভদ্রতায় বাঁধছে। সমাজে বাস করার এই হচ্ছে সমস্যা। সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। ইচ্ছা করলেও কারোর চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া যায় না।

ফরিদ মেঘ গর্জন করল, এই ব্যাটা উঠ।

ডাক্তার ধড়মড় করে উঠে বসল। তার কাছে সব কিছুই এলোমেলো। এখানে সে কি করছে? ঘুমুচ্ছে না-কি? এখানে ঘুমুচ্ছে কেন? সামনে ফরিদ মামা না? উনি এমন করে তাকিয়ে আছেন কেন?

'স্লামালিকুম মামা।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'কি করছেন মামা?'

'তেমন কিছু করছি না। একটু আগে ভয়ংকর কিছু করার ইচ্ছা করছিল এখন করছে না।

ডাক্তারকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফরিদ নিজের ঘরে চলে গেল। ঠাণ্ডা পানিতে ঘাড় ভিজিয়ে নিতে হবে তাতে মুল স্নায়ু শীতল হবে। বেশ খানিকটা ক্যাফিনও শরীরে ঢুকাতে হবে।

এতেও স্নায়ুর উত্তেজনা খানিকটা কমবে। কাদেরকে চায়ের কথা বলা দরকার। চিনি দুধ ছাড়া কড়া চা। প্রচুর ক্যাফিন দরকার। শুধু ক্যাফিনে কাজ হবে না, গানও লাগবে। এইসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সংগীত খুব কাজ করে। মেঘের পরে মেঘ জমেছে এই বিশেষ গান-টি রাগ কমানোর ব্যাপারে কোরামিন ইনজেকশনের মত। পরপর দু'বার শুনলেই রাগ- জল। আজ ঐ গানটিরও সাহায্য দরকার। আজকের অবস্থা বড়ই খারাপ।

ডাক্তারের ঘুম এখন পুরোপুরি ভেঙ্গেছে।

সে এই মুহূর্তে বড় ধরনের লজ্জাও বোধ করছে। পুরো ব্যাপারটা এখন মনে পড়ছে। ক্ষুধার উপর লেখা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কি অসম্ভব লজ্জার কথা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মিলি নিশ্চয়ই ঘটনা শুনেছে। না জানি সে কি ভাবছে। তাকে গাধা ভাবছে নিশ্চয়ই।

রাত এখন প্রায় দেড়টা। এত রাতে চুপচাপ সোফায় শুয়ে থাকা ছাড়া কোন গতি নেই। কিন্তু আবার ক্ষিধেও লেগেছে। ক্ষুধা ব্যাপারটা কত ভয়াবহ তা প্রবন্ধ পড়ে ঠিক বোঝা যায় নি- এখন বোঝা যাচ্ছে। তার মনে পড়ল আজ দুপুরেও তেমন কিছু খাওয়া হয়নি।

ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে চোখের সামনে শুধু নানান রকম খাবারের ছবি ভাসছে। এই মুহূর্তে যে ছবিটি ভাসছে সেই ছবিটি বেশ অস্বস্তিকর-বিশাল একটা চিনামাটির প্লেট। সেই প্লেটে শিউলি ফুলের মত দেখতে পোলাও। পোলাওয়ের উপর আস্ত একটা ভেড়ার রোস্ট। রোস্টটির বর্ণ সোনালী। এত জিনিষ থাকতে চোখের সামনে ভেড়ার রোস্ট ভাসছে কেন সেটা একটা রহস্য। চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর ভেড়া এবং ছাগলে কোন তফাৎ নেই তবু কেন শুধু ভেড়ার কথা মনে হচ্ছে? রোস্টটাতো ছাগলেরও হতে পারে।

খুট করে শব্দ হল।

ঘরে ঢুকল পুতুল। তার ঘুম আসছিল না। সে এসেছিল পানি খেতে। বসার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে কৌতুহলী হয়ে এসেছে। ডাক্তারকে এত রাতে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সে খুবই অবাক হয়েছে। তবে অবাক হওয়াটা সে প্রকাশ হতে দিল না। সহজ স্বরে বলল, স্লামালিকুম।

মনসুর বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। ভাল আছ?

এই মেয়েটির সঙ্গে তার অনেকবার দেখা হয়েছে তবে কখনো তেমন আলাপ হয়নি। মেয়েটা যে এতটা সুন্দর সে আগে লক্ষ্য করেনি। আলাদাভাবে এর নাক মুখ চোখ কোনটাই

সুন্দর না তবু সব কিছু মিলিয়ে মেয়েটাকে দেখতে তো বড় ভাল লাগছে। মনসুর উৎসাহের সঙ্গে বলল, কেমন আছ পুতুল? পুতুল বিস্মিত গলায় বলল,

'ভাল'

'আমি ক্ষুধা বিষয়ক লেখাটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপারটা খুবই অন্যায় হয়েছে– জেগে দেখি সোফায় শুয়ে আছি–মাথার নীচে বালিশ।'

'মশার কামড়ে ঘুম ভেঙ্গেছে?'

'না মশা না। অন্য কোন কারণে ঘুম ভেঙ্গেছে। আমার মনে হয় ক্ষিধের কারণে। প্রচন্ড ক্ষিধে লেগেছে বুঝলে পুতুল।'

পুতুল বলল, আপনি বসুন দেখি ঘরে কি আছে।'

'তোমার কষ্ট করার দরকার নেই পুতুল। তবে ফ্রীজটা খুলে দেখ। ঠান্ডা গরমে কোন অসুবিধা নেই।'

'আপনি বসুন আমি দেখি–'

বাহ মেয়েটার কথা থেকে গ্রাম্য ভাবটাওতো দূর হয়েছে। মেয়েটাকে বুদ্ধিমতী বলেও মনে হচ্ছে। মনসুরের মনে হল মেয়েটা কোন একটা ব্যবস্থা করবেই। কিছু না পেলে দু'টো ডিম ওমলেট করে নিয়ে আসবে।

মনসুরের চোখে আগের দৃশ্য ফিরে এল। সেই ভেড়ার রোস্ট। তবে তার সঙ্গে নতুন কিছু চিত্র যুক্ত হয়েছে। ভেড়ার রোস্টের উপর এখন মুরগীর রোস্টও দেখা যাচ্ছে।

আধ ঘন্টা পর পুতুল এসে বলল, খেতে আসুন।

খাবার ঘরে খাবার দেয়া হয়েছে। ভাত, রুই মাছের তরকারী, উচ্ছে ভাজা, ডাল। সবই গরম। রীতিমত ধোঁয়া উঠছে। একটা প্লেটে পেয়াজ 'কাঁচামরিচ' দু'টুকরা লেবু।

হতভম্ব মনসুর বলল, সব কি এখন রান্না করলে?

পুতুল হাসতে হাসতে বলল, এত অল্প সময়ে বুঝি রান্না করা যায়। সবই ফ্রীজে ছিল। আমি শুধু গরম করেছি। আপনি খেতে বসুন।

পুতুল প্লেটে ভাত উঠিয়ে দিল।

মিলির ঘুম আসছিল না। একটা মানুষ সোফায় শুয়ে আছে। হয়ত বেচারাকে মশারা ইতিমধ্যে খেয়ে ফেলেছে। একজনকে এই অবস্থায় রেখে ঘুমুতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সে নিঃশব্দে বসার ঘরে ঢুকল। সেখান থেকে খাবার ঘরে। খাবার ঘরে কি হচ্ছে? মনসুর খাচ্ছে? কে খাওয়াচ্ছে তাকে? তাকে দু'জনের কেউ লক্ষ্য করল না। মিলি পর্দার আড়াল থেকে লক্ষ্য করল দু'জন কি সুন্দর গল্প করছে। এত খাতির দু'জনের মধ্যে? কৈ এই খাতিরের কথাতো তার জানা ছিল না? আবার হাসির শব্দ আসছে। খিল খিল করে নিশ্চয়ই পুতুল মেয়েটাই হাসছে। রাগে মিলির গা জ্বলে যেতে লাগল। যদিও সে খুব ভাল করেই জানে রাগ করার কিছুই নেই। কেন সে রাগ করবে? তার রাগ করার কি আছে?

হাসাহাসির কারণ হচ্ছে ঠিক এই সময় ডাক্তার একটা মজার রসিকতা করছিল– রসিকতাটা বানর বিষয়ক। ডাক্তার কখনো রসিকতা করে কাউকে হাসাতে পারে না। এই প্রথম সে একজন গ্রাম্য বালিকাকে মুগ্ধ করল–পুতুল হাসতে হাসতে ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ল। কিংবা কে জানে এই গ্রাম্য বালিকাটি হয়ত মুগ্ধ হবার অভিনয় করল। ডাক্তার অভিনয় ধরতে পারল না।

পর্দা ধরে ঈর্ষায় নীল হয়ে গেল মিলি। তার ভেতরে এত ঈর্ষা ছিল তাও সে জানত না। সে যেভাবে এসেছিল সেইভাবে ফিরে গেল। নিজের উপস্থিতি সে কাউকে জানতে দিল না।

বানর গল্পের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডাক্তার দ্বিতীয় গল্প শুরু করল। পুতুল এই গল্পটিও চোখ বড় বড় করে শুনল এবং এক সময় হেসে উঠল খিল খিল করে।

ডাক্তার বানর বিষয়ক তৃতীয় গল্প খুঁজতে শুরু করল। তেমন কোন গল্প মনে পড়ছে না। এই মেয়েটি বানর ছাড়া অন্য কোন গল্পে হাসবে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। রিক্স নেয়া ঠিক হবে না। বানর সংক্রান্ত গল্পই মনে করতে হবে। ডাক্তারের ধারণা মেয়েদের ব্রেইন Unidirectional. যে মেয়ে বানর সংক্রান্ত রসিকতায় হাসে সে অন্য রসিকতায় হাসবে না। তাকে বানর বিষয়ক গল্পই বলতে হবে। অন্য গল্প না। নারী জাতি খুব প্রবলেমের জাতি। এক চক্ষু হরিণীর মত।

২০

নাস্তার টেবিলে সোবাহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ফরীদ তুমি যাওনি, ফরিদ তার চেয়েও বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাব?

'তুমি বলেছিলে–এ বাড়িতে থাকবে না।'

ফরিদ টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, ভালমত চিন্তা করে দেখলাম–হুট করে কোন ডিসিসান নেয়া উচিত না।'

'তাহলে মিথ্যা কথা বললে কেন?'

'মিথ্যা কখন বললাম?'

'গত রাতেই তো বললে।'

'বলেছি ভাল করেছি। এই নিয়ে আপনি দয়া করে এখন ক্যাট ক্যাট করবেন না। এম্নিতেই রাতে ভাল ঘুম হয়নি।'

ফরিদ তার নাশতার প্লেট নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

সোবাহান সাহেব, এমদাদ খোন্দকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেশটা নষ্ট হচ্ছে কেন জানেন?

দেশ নষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না এই নিয়ে এমদাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এমদাদ এই মুহূর্তে রুটিতে পুরু করে মাখন লাগাতে ব্যস্ত। দেশ সম্পর্কে ভাববার ফুসরত কোথায়?

এমদাদ বলল, আমাকে কিছু বললেন?

'হ্যা। দেশটা কেন নষ্ট হচ্ছে জানেন?'

'জ্বি না।'

'জানতে হবে। এইসব নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু মাখন দিয়ে রুটি খেলে হবে না।'

'অবশ্যই। অবশ্যই ভাবতে হবে।'

সোবাহান সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'দেশটা নষ্ট হবার মূল কারণ হল আমাদের মিথ্যা বলার প্রবণতা।'

'তাতো ঠিকই বলেছেন জনাব। একবারে ঠিক।'

'জাতি হিসেবেই আমরা মিথ্যাবাদী।'

'অবশ্যই।'

'আমরা প্রতিজ্ঞা করি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার জন্যে।'

আসল কথা বলেছেন। লাখ কথার এক কথা'

এমদাদ, সোবাহান সাহেবের প্রতিটি কথায় একমত হতে লাগল। সে সাধারণতঃ কারো কোন কথাতেই দ্বিমত পোষণ করে না। এমদাদ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছে যে মানুষের সঙ্গে সু–সম্পর্ক বজায় রাখার একটা পথ হচ্ছে সব কথায় একমত হওয়া।

'এমদাদ সাহেব?'

'জ্বি।'

'সত্যি কথা বলার প্রবণতা যদি আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'অবশ্যই হয়।'

'মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। চারদিকে শুধু মিথ্যা। এটা দূর করতে হবে।'

'অবশ্যই হবে।'

'সত্যবাদী জাতি হিসেবে আমরা যদি নিজেদের প্রমাণ করতে পারি তাহলে অবস্থাটা কি হবে আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন এমদাদ সাহেব?'

'জ্বি না।'

'আমার গা শিউরে উঠছে। পৃথিবীর লোক জানবে বাঙ্গালী মিথ্যা বলে না। বাঙ্গালী সত্যবাদী। আমাদের আসনটা কি রকম হবে চিন্তা করুন। কত সম্মান কত .....

সোবাহান সাহেব আবেগে আপ্লুত হয়ে কথা শেষ করতে পারলেন না। বাঙ্গালী জাতিকে সত্যবাদী কি করে করা যায় তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। গাঢ় স্বরে বললেন, এমদাদ সাহেব?

'জ্বি।'

'জিনিসটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

'অবশ্যই হবে।'

চা শেষ না করেই সোবাহান সাহেব উঠে পড়লেন। ক্ষুধা অবশ্যই একটি ভয়াবহ ব্যাপার তবে তারো আগে হচ্ছে সত্যবাদিতা। একটি সত্যবাদী জাতি নিশ্চয়ই ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না।

এমদাদ নাশতার টেবিলে একা বসে রইল। তার জন্যে ভালই হল। একা থাকলে ইচ্ছামত খাওয়া দাওয়া করা যায়। একটা ডিমের জায়গায় দু'টা ডিম নিলে কেউ বলবে না–এই বয়সে দু'টা ডিম খাওয়া ঠিক না। কোলেস্ট্যরল না–কি যেন ঝামেলা হয়। ডাক্তার ছোকরা বলছিল। আরে বাবা আল্লাহতালা তাহলে ডিম দিয়েছেন কি জন্যে? খাওয়ার জন্যেই তো। আল্লাহতালা তো না ভেবে চিন্তে কিছু দেন নাই। তিনি না ভেবে চিন্তে কিছু করবেন তা–কি হয়?

মিলি এসে বলল, বাবার কি নাশতা খাওয়া শেষ হয়ে গেল চাচা?

'হ্যা মা।'

'চা –তো শেষ করেননি।'

'সুখি মানুষ। মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা চিন্তা এসে গেল– খাওয়া দাওয়া বন্ধ।'

মিলি চিন্তিত গলায় বলল, আবার কি চিন্তা?

'সবাইকে সত্য কথা বলতে হবে–এই চিন্তা।'

মিলি চিন্তিত মুখে বাবার ঘরের দিকে এগুলো।

এমদাদ প্লেটে পড়ে থাকা তৃতীয় ডিমটিও নিয়ে নিল। দু'টা খাওয়া গেলে তিনটিও খাওয়া যায়। যাহা বাহান্ন তাহা পয়ষট্টি। এমদাদের মনও আজ খুব প্রসন্ন। কেন প্রসন্ন নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। পুতুলের কাছ থেকে গত রাতের বর্ণনা শোনার পর থেকেই মনটা দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। নতুন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। আশার আলো ডাক্তার ছোকরা প্রসঙ্গে। চেষ্টা

চরিত্র করে পুতুলের সঙ্গে এই ছোকরাকে গেঁথে ফেলা খুব কি অসম্ভব? এই জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এই জগতে সবই সম্ভব। চেষ্টা চালাতে হবে। চেষ্টা।

সোবাহান সাহেব 'সত্য দিবস' বিষয়ে চিন্তা করছেন। তাঁর চিন্তার সূত্রগুলি এখনো স্পষ্ট নয় তবু তিনি যা ভাবছেন তা হচ্ছে সপ্তাহের একটি দিনকে কি 'সত্য দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা যায় না? যেমন মঙ্গলবার, কিংবা বুধবার। এই দিনে কেউ মিথ্যা কথা বলবেন না। সবাই সত্য কথা বলবে। সব বড় বড় কাজ ঐ দিনটির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। প্রয়োজনে এই দিন আরো বড় করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়া যায়। যেমন বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ঠিক এই রকম হবে বিশ্ব সত্য দিবস। এই দিনে পৃথিবীর সব মানুষ সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধুই সত্যি কথা বলবে।

মিলি ঘরে ঢুকে বলল, বাবা তুমি চা না খেয়েই চলে এসেছ?

'টেবিলের উপর রাখ মা, খাব।'

'নতুন কিছু নিয়ে ভাবা শুরু করেছ?

'হু। সত্য দিবস।'

'ভাল।'

'না শুনেই বলে ফেললি ভাল? আগে জিনিসটা কি জানবি তারপর বলবি ভাল। বোস– বুঝিয়ে বলছি।'

'আজ আমার সময় নেই বাবা। অন্য একদিন শুনব।'

'সেটাও মন্দ না। আমি নিজেও এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হইনি। প্রচুর ভাবনা চিন্তা করতে হবে। দেশটা পড়ে গেছে মিথ্যার খপ্পরে। সত্য আজ নির্বাসিত। সেই নির্বাসিত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

'চা খাও বাবা। চা ঠান্ডা হচ্ছে।'

'দেশটাই ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে মা। আর চা। আগে দেশটাকে আমাদের চাঙ্গা করতে হবে। দেশটা চলে গেছে কোল্ড স্টোরেজে। সেখান থেকে দেশটাকে বের করে তাকে গরম করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সত্যকে। একবার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই। আচ্ছা আনিস ছোকরা কি ফিরেছে? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'জ্বি বাবা উনি ফিরেছেন। ডেকে দেব?'

'না থাক। আমি চিন্তাগুলি আরো গুছিয়ে নেই। এখনো সব এলোমেলো আছে। তুই কাজে যা। তোকে দেখে এখন কেন জানি রাগ লাগছে।'

মিলি শুকনো মুখে বাবার ঘর থেকে বের হল। তার নিজের শরীরটা ভাল নেই। জ্বর জ্বর লাগছে। বাবার বকবকানি শুনতে একটুও ভাল লাগছে না।

সোবাহান সাহেব সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাবলেন। মাগরেবের নামাজের পর পারিবারিক সভা ডাকলেন। তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা পারিবারিক সভাতে জানানোই ভাল।

পারিবারিক সভাগুলি সাধারণতঃ রাতের খাবারের পর হয়। এটা জরুরী সভা বলে আগেই শুরু হল। সভার শেষে রাতের খাওয়া হবে।

বসার ঘরে সভা বসেছে। পারিবারিক সদস্যদের বাইরেও কিছু মানুষজন আছে যেমন এমদাদ ও তাঁর নাতনী। আনিসের পুত্র কন্যা। আনিস আসেনি তার মাথা ধরেছে। সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের দস্তখত নেয়া হল। যে কোন পারিবারিক সভার এই অংশটি রহিমার মা'র

খুব পছন্দ। আগে সে টিপ সই দিত। এখন দস্তখত দেয়। দস্তখত দেয়া নতুন শিখেছে। দস্তখত দিতে তার বড় ভাল লাগে।

পরিবারিক সভার প্রসিডিংস সাধারণত লিখে মিলি। আজ বিলু লিখছে। কে কি বলছে, কি আলোচনা হচ্ছে সবই লিখিতভাবে থাকার কথা। তা সব সময় সম্ভব হয় না। বিলু মিলির মত দ্রুত লিখতে পারে না।

সভার শুরুতে সোবাহান সাহেব পুরো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি মনে করেন সপ্তাহে অন্তত একটি দিন সত্যি কথা বলার চেষ্টা আমাদের থাকা উচিত ইত্যাদি ·····। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যদের মতামত চাইলেন। কারো কিছু বলার থাকলে সে বলতে পারে। তবে বলার আগে হাত তুলতে হবে। প্রস্তাবের পক্ষে হলে ডান হাত। প্রস্তাবের বিপক্ষে হলে বাঁ হাত।

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লক্ষ্য করলেন ফরিদ দু'হাত তুলে বসে আছে। সোবাহান সাহেব বললেন, তুমি কিছু বলতে চাও?

'জ্বি।'

'প্রস্তাবের পক্ষে না বিপক্ষে?'

'দুটোই।

'তার মানে? রসিকতা করছ না—কি?'

ফরিদ গম্ভীর গলায় বলল, আপনার সাথে রসিকতা করার অধিকার আমার আছে। সম্পর্ক সেই রকম তবে আজ আমি আপনার প্রস্তাব একই সঙ্গে সমর্থন করছি আবার করছি না।

'তার মানেটা কি?'

'আমার মতে সত্য দিবস থাকা উচিত এবং পাশাপাশি মিথ্যা দিবস বলে একটি দিবসও থাকা উচিত।'

'তোমার কথা বুঝলাম না।'

'সত্য দিবসে আমরা যেমন সত্য কথা বলব মিথ্যা দিবসে আমরা তেমনি শুধু মিথ্যা কথা বলব। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধুই মিথ্যা। ঘরে মিথ্যা বলব, বাইরে মিথ্যা বলব, এমনকি সেদিন যদি মসজিদে যাই সেখানেও মিথ্যা বলব।'

সোবাহান সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফরিদ সেই অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, সমস্ত দিন মিথ্যা কথা বলার ফল কি হবে সেটাও বলে দিচ্ছি মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা আমাদের কমে যাবে। অন্যান্য দিনগুলিতে আমাদের মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা করবে না। পারিবারিক পর্যায়ে যেমন মিথ্যা দিবস থাকবে তেমনি জাতীয় পর্যায়েও মিথ্যা দিবস থাকবে। সেই দিন দেশের সবচে বড় মিথ্যাবাদীকে আমরা পুরস্কার দেব। উপাধিও দেয়া হবে। যেমন—মিথ্যা শ্রেষ্ঠ। কিংবা জাতীয় মিথ্যুক।

'চুপ কর।'

'চুপ করব কেন? পারিবারিক সভায় আমার কথা বলার পুরো অধিকার আছে। আমি অবশ্যই কথা বলতে পারি। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম—দেশে একটা মিথ্যা একাডেমী স্থাপিত হবে। সেই একাডেমীর কাজ হবে জাতীয় পর্যায়ের মিথ্যুকরা কে কি ভাবে মিথ্যা বলছেন তার একটা রেকর্ড রাখা। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন এক নেতা পত্রিকায় একটা বিবৃতি দিলেন। দু'দিন পর সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা বিবৃতি দিলেন। একাডেমীর কাজ হবে এই সব লক্ষ্য রাখা। এবং প্রয়োজনবোধে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের মত মিথ্যা একাডেমী

পুরস্কার প্রচলন করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে একজনের নাম প্রকাশ করতে পারি যিনি সাধারণতঃ মসজিদে মিথ্যা বলেন। সেই মিথ্যা ফলাও করে রেডিও টিভিতে প্রচার করা হয়।'

সোবাহান সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে?'

'জ্বি না। আমার আরো কিছু বলার আছে।'

'তুমি যে একটা গাধা তা-কি তোমার জানা আছে?

'দুলাভাই পারিবারিক সভায় একজন সদস্যকে গাধা বলাটা ঠিক হচ্ছে না।'

'অবশ্যই ঠিক হচ্ছে। বিলু তুই লেখ পারিবারিক সভায় ফরিদকে গাধা সাব্যস্ত করা হল। কাগজপত্রে রেকর্ড থাকা দরকার। বিলু বলল, তুমি একা গাধা বললেতো বাবা হবে না। সবাইকে একমত হতে হবে। তাছাড়া আমি নিজে মনে করি মামার আইডিয়ার একটা স্যাটায়ারিক্যাল ভ্যালু আছে।'

কাদের এই পর্যায়ে উঠে দাঁড়াল এবং গম্ভীর গলায় বলল, আমার মনে হয় মামার মত বুদ্ধির লোক এই দুনিয়ায় আল্লাহতালা বেশি পয়দা করে নাই। এইটা কাগজে-পত্রে ছাপা দরকার। আফা আপনে আমার মতামত লেখেন।

বিলু সোবাহান সাহেবের মতামতের পাশে কাদেরের মতামতও লিখল। তবে সভায় শুধু মাত্র সত্য দিবসের উপরই সিদ্ধান্ত নেয়া হল। ঠিক হল এই বাড়িতে মঙ্গলবার হবে সত্য দিবস। এই সত্য দিবসে কেউ কোন মিথ্যা বলবে না। কাদের প্রশ্ন তুলল, জীবন রক্ষার জন্যে যদি মিথ্যা বলার দরকার হয় তখন কি করা? এর উত্তরে সোবাহান সাহেব বললেন, চুপ কর গাধা।

মিলি বলল, পারিবারিক সভায় সব সদস্যদের তুমি গাধা বলছ এটাতো বাবা ঠিক হচ্ছে না। কাদের অন্ধকার মুখ করে বলল, বিষয়টার নিন্দা হওয়া দরকার।

গভীর বিস্ময়ে পুরো ব্যাপারটা পুতুল লক্ষ্য করছে। এ রকম একটা ব্যবস্থা যে কোন বাড়িতে চালু থাকতে পারে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। জীবনকে আনন্দময় করে তোলার এই সব উপকরণ তাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করল। শুধু এমদাদ খোন্দকার সারাক্ষণ মুখ বিকৃত করে রইলেন এবং রাতে ঘুমুতে যাবার সময় পুতুলকে বললেন, আইজ একটা জিনিস শিখলামরে পুতুল।

পুতুল বলল, কি জিনিস?

'আইজ শিখলাম যে দলের গোদা যদি বেকুব হয় তা হইলে সব কয়টা বেকুব হয়। এই বাড়ির সব কয়টা মানুষ চাপে বোকা এইটা লক্ষ্য করছস?'

পুতুল মুগ্ধ স্বরে বলল, এইসব কান্ড কারখানা আমার বড় ভাল লাগছে। এদের নিয়া কোন মন্দ কথা তুমি বলবা না দাদাজান।

'বেকুবরে বেকুব বলব না?'

'এরা বেকুব না দাদাজান। এরা······'

পুতুল কথা শেষ করল না। তার অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু দাদাজানকে এসব বলার অর্থ হয় না। দাদাজান বুঝবে না। সবাই সব জিনিস বুঝে না।

পুতুলের ইচ্ছা করছে তার নিজের যখন একটা সংসার হবে সেই সংসারেও এ রকম পারিবারিক সভা বসবে। সেই সভার সব বিবরণও এরকম করে লেখা হবে। আলোচনা হবে। জীবনের এক ঘেঁয়েমী এইভাবেই দূর করা হবে। একটাইতো আমাদের জীবন। লক্ষ কোটি জীবনতো আমাদের না। কেন আমরা এই জীবনকে সুন্দর করব না?

সত্য দিবস খুব কঠিনভাবে পালিত হতে থাকল।

মঙ্গলবার ভোরে ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা হয় আজ সত্য দিবস। কাদের সেই ব্ল্যাক বোর্ড বসার ঘরে ঝুলিয়ে দিয়ে আসে। সত্য দিবস শুরু হয়। কাদের এবং রহিমার মা দু'জনই এই দিবস কঠিন ভাবে মেনে চলে। যে ইলিশ মাছ অন্যদিন পঞ্চাশ টাকায় আনা হয় সেই মাছ মঙ্গলবারে কেনা হয় চল্লিশ টাকায়।

মিনু বিস্মিত হয়ে বলেন, আজ মাছ সস্তা নাকি?

কাদের উদাস হয়ে বলে– না।

মিনু বলেন, তাহলে তুই চল্লিশ টাকায় এই মাছ আনলি কি করে?

কাদের চুপ করে থাকে। কথা বলতে গেলেই সমস্যা। থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে। সারাটা দিন তার বড়ই অস্বস্তিতে কাটে। রাত বারটায় হাফ ছেড়ে বাঁচে।

পুতুলও সত্য দিবসের ব্যাপারটা খুব মনে রাখতে চেষ্টা করে। এমনিতেই তার মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না তবু মঙ্গলবারে সে আরো সাবধান থাকে। যেন ভুলেও কোন মিথ্যা বের না হয়। পুতুল খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করল এই মঙ্গলবারেই বেছে বেছে তার দাদাজান বড় বড় মিথ্যা কথাগুলি বলেন। কেন তিনি এমন করেন কে জানে। মিথ্যা কথা গুলি অন্যদিন বললে কি হয়? এই নিয়ে আনিসের সঙ্গে তার কথা হল। আনিস হেসে বলল, সত্য দিবসের ব্যাপারটা তুমি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ বলে মনে হয়। এটা এমন কঠিন ভাবে গ্রহণ করার কিছু নেই।

পুতুল বিস্মিত হয়ে বলল, নেই কেন?

আনিস হাসতে হাসতে বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই ভুল।'

'ভুল?'

'হ্যাঁ ভুল। সপ্তাহের একটা বিশেষ দিন সত্য দিবস এর মানে হচ্ছে সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে মিথ্যা বলা যাবে।' সত্য বলতে হবে সত্য দিবসে। ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে না?'

পুতুল কিছু বলল না। সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। এমন ভাবে সে ভাবেনি। আনিস বলল, দেখ পুতুল–দিবসের ব্যাপারটাই আমার ভাল লাগে না–একটা বিশেষ দিনকে করা হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস। সব দিনইতো শিশু দিবস হওয়া উচিত। উচিত না?'

'হ্যাঁ তাতো ঠিকই।'

'অবশ্যি এইসব দিবসের একটা উপকারিতাও আছে।'

'কি উপকারিতা?'

'মনে করিয়ে দেবার একটা ব্যাপার আছে। বৎসরের একটি বিশেষ দিনকে সত্য দিবস করা মানে ঐ দিনে সত্য কথার প্রয়োজনীয়তার দিকটির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পুতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি দু'দিকেই যুক্তি দিতে পারেন।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, তা পারি। এই পৃথিবীতে সব কিছুর অভাব আছে কিন্তু যুক্তির অভাব নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেমন কঠিন যুক্তি আছে বিপক্ষেও তেমনি কঠিন যুক্তি আছে।

'আপনি আল্লাহ্ বিশ্বাস করেন না কেন?

'তুমি কর?'

'কি আশ্চর্য আমি করব না? আপনি সত্যি করেন না?'

'না। রাত্রির সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হত। সে তর্কে হেরে যেত। তর্কে হেরে গেলেই তার অসম্ভব মেজাজ খারাপ হত। একবার তর্কে হেরে সে কি করল জান? আমার খুব দামী একটা পাঞ্জাবী ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলল।

আনিস অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। রাত্রির কথা সে কখনো মনে করতে চায় না। কিন্তু এই মেয়েটির নানান ভঙ্গিতে রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি কি পুতুল ইচ্ছা করেই করে?

আনিস খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করে। পুতুলের চোখে সে এক ধরনের মুগ্ধতা দেখতে পায়। এই মুগ্ধতা সব সময় থাকে না। হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠে। পরক্ষণেই মেয়েটির মুখ বিষণ্ন হয়ে যায়। আনিস রাত্রির চোখেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিল। এই মুগ্ধতা দেখার একটা আলাদা নেশা আছে। একবার দেখতে পেলে বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। আনিস লক্ষ্য করছে সে ইদানিং নিজের অজান্তেই এই মেয়েটিকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। সে জানে ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না একেবারেই ঠিক হচ্ছে না। সাবধান হতে হবে। আরো সাবধান হতে হবে।

এমদাদ সাহেব তাঁর এ বাড়িতে আসার কারণ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার জন্যে যে দিনটি বেছে নিল সে দিনটি মঙ্গলবার – সত্য দিবস।

সকাল বেলা সোবাহান সাহেব বাগানে হাঁটছিলেন। এমদাদ সেখানেই তাঁকে ধরল। সোবাহান সাহেব বললেন, কিছু বলবেন?

এমদাদ বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, অবশ্যই বলব। আপনারে বলবনাতো বলব কারে? আপনে হইলেন বটবৃক্ষ।

'গৌরচন্দ্রিকার দরকার নেই। কি বলতে চান বলে ফেলুন।'

এমদাদ হাত কচলে বলল, 'নাতনীটার একটা ব্যবস্থা করার জন্যে জনাবের কাছে আসলাম। জানি –মুখ ফুটে একবার বলে ফেলতে পারলে সব সমস্যার সমাধান। বলেই ফেললাম। এখন আপনি হইলেন বটবৃক্ষ। যা করবার আপনি করবেন। আমার কাজ শেষ।'

'আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। কার কি ব্যবস্থার কথা বলছেন?'

'পুতুলের একটা বিবাহ দেয়ার কথা বলতেছি।'

'পুতুলের বিয়ে? কি বলছেন আপনি? ওতো বাচ্চা একটা মেয়ে। মেট্রিক পাস করেছে এখন পড়াশোনা করবে।'

'মেয়েছেলে পড়াশোনা করে কি করবে জনাব? মেয়েছেলেকে তৈরী করা হয়েছে সন্তান পালনের জন্য।'

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, এইসব বলেছে কে আপনাকে? মেয়েরা কি সন্তান তৈরীর মেশিন না–কি?

'বলতে গেলে তাই। বুঝতেছি আপনার শুনতে খারাপ লাগতেছে তবে এইগুলি হল সত্য কথা। আজ মঙ্গলবার সত্য দিবস। সত্য দিবসে মিথ্যা বলে পাপ করব আমি এমন লোক না। তা ছাড়া জনাব আমি বেশী দিন বাঁচব না। মৃত্যুর আগে দেখতে চাই নাতনীটার একটা গতি হয়েছে। এইটা দেখে যেতে পারলে মরেও শান্তি।

সোবাহান সাহেবের চোখের দৃষ্টি থেকে বিরক্ত ভাবটা গেল না। বরং আরো দৃঢ় হল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, এত অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ের পক্ষপাতি আমি না। আমার ফিলসফি হচ্ছে– মেয়েরা পুরোপুরি স্বাবলম্বী হবার পর বিয়ে করবে। পুতুলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার এখানে থেকেই সে পড়াশোনা করতে পারে। তাছাড়া তার নিজেরও সে রকম ইচ্ছা। আমাকে কিছু বলেনি তবে আমার স্ত্রীকে বলেছে।

এমদাদের মুখ হা হয়ে গেল। পুতুল তাকে না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে এই কাজ করছে তা সে কল্পনা করেনি। এমদাদ বলল, পড়াশোনার কথা যে বলছেন জনাব সেতো বিয়ের পরেও হতে পারে। একটা ভাল ছেলে যদি পাওয়া যায় সে বিয়ের পরেও মেয়ে পড়াবে।

'সে রকম ছেলে পাবেন কোথায়?'

এমদাদ নীচু গলায় বলল, হাতের কাছে একজন আছে! আপনি মুখে একটা কথা বললে বিয়েটা হয়ে যায়। আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

'সেই ছেলে কে?'

'মনসুর। আমাদের ডাক্তার।'

'ডাক্তার?'

'জ্বি। পুতুলরে তার খুবই পছন্দ। সব সময় দেখি কুটুর কুটুর গল্প করে।'

'তাই না-কি?'

'এক রাতে মনসুর এই বাড়িতে ছিল। ঐ রাতে পুতুল নিজেই ভাত টাত বেড়ে খাওয়াল। তার থেকে বুঝলাম পুতুলের নিজেরও ইচ্ছা আছে। এখন আপনি যদি শুধু একটু বলেন তাহলেই দুই হাত এক করে দিতে পারি।'

'কাকে আমি কি বলব?'

'মনসুরকে বলবেন।'

'আমি বললেই হবে?'

'অবশ্যই।'

'আচ্ছা দেখি।'

'তাতো দেখবেনই। আপনি না দেখলে কে দেখবে? আপনি হইলেন বটবৃক্ষ।'

'বটবৃক্ষ শব্দটা আমার সামনে দয়া করে আর উচ্চারণ করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা-তবে সত্য কথা না বললেই বা কি করি? আজ আবার মঙ্গলবার। সত্য দিবস। বটবৃক্ষকে বটবৃক্ষ না বললে-মিথ্যাচার হয়।'

সোবাহান সাহেব কঠিন চোখে তাকালেন। সেই দৃষ্টির সামনে এমদাদ চুপসে গেল। বটবৃক্ষ বিষয়টা নিয়ে আর আগানো ঠিক হবে না। তবে আজ কাজ মন্দ অগ্রসর হয়নি।

২১

আড়ি পেতে কিছু শোনার মত মানসিকতা বিলুর নেই।

তবু সে আড়ি পেতেছে। একে আড়ি পাতা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। সে আনিসের ঘরের বাইরে দরজার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। ভেতরের কথা-বার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আনিস তার পুত্র-কন্যার সঙ্গে গল্প করছে। এমন কিছু গল্প নয়, তবু শুনতে চমৎকার লাগছে। রাত প্রায় ন'টা। ওরা বাতি জ্বালায়নি। ঘর অন্ধকার করে গল্পের আসর জমিয়েছে। বিলুর ইচ্ছা করছে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলে, আমাকে দলে নিন আনিস সাহেব, আমিও গল্প শুনব। তা বলা সম্ভব নয়। সবাইকেই অনেক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। মনের অনেক ইচ্ছা মনে চেপে রাখতে হয়। বিলুদের যে টিচার ফিজিওলজি পড়ান বিলুর খুব ইচ্ছা করে কোন একদিন তাঁকে বলতে- 'স্যার, আপনার পড়ানোর ধরণ আমার খুব ভাল লাগে। আমি এই জীবনে আপনার মত ভাল টিচার পাইনি, পাব বলেও মনে হয় না।" এমন কিছু কথা না যা একজন সম্মানিত শিক্ষককে বলা যায় না। অবশ্যই বলা যায়। বিলু একদিন সেই কথাগুলি বলার জন্যে স্যারের ঘরে ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই স্যার বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন-কি চাই? বিলু থতমত খেয়ে বলল, কিছু

না স্যার। এইবার তিনি গর্জন করলেন সিংহের মত,–কিছু না, তাহলে বিরক্ত করছ কেন? গেটআউট।

বিলু কেঁদে ফেলেছিল। কি অসম্ভব লজ্জা। গেট আউট বলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া। ছিঃ ছিঃ।

বিলুর মনে হচ্ছে আজ যদি সে আনিস সাহেবের ঘরে ঢুকে বলে আপনাদের মজার মজার গল্পে অংশ নিতে এসেছি তাহলে তিনি হয়ত শুকনো গলায় বলবেন, আপনি কিছু মনে করবেন না। এখন আমাদের পারিবারিক সেসন চলছে। বাইরের কেউ আসতে পারবে না। নিয়ম নেই। আবারো বিলুর চোখে পানি আসবে। ইনি অবশ্যি স্যারের মত "গেট আউট" বলবেন না। সবাই সব কিছু পারে না। ঐ স্যারটা ছিল পাগলা। ক্লাসের মধ্যে একবার একটি মেয়ে শব্দ করে হেসে উঠেছিল বলে তিনি চড় মারার ভঙ্গি করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মেয়ে ভয়ে অস্থির। ঠক ঠক করে কাঁপছে। ভাগ্য ভাল– স্যার সেদিন নিজেকে সামলে নিলেন। চাপা গলায় বললেন, কামিজ পরিহিতা সুদর্শনা তরুণী! তোমার কি ধারণা আমি একজন গোপালভাড়? আমি তোমার সঙ্গে ভাঁড়ামী করছি? খবর্দার আর যেন হাসতে না দেখি। আরেকবার হাসলে সাড়শি দিয়ে টেনে তোমার উপরের পাটির একটা দাঁত তুলে ফেলব। উইদাউট এনেসথেসিয়া। এনেসথেসিয়া দেয়া হবে না।

আনিস সাহেবকে দেখলেই বিলুর ঐ স্যারের কথা মনে পড়ে। কেন পড়ে বিলু ঠিক জানে না। দু'জনের মধ্যে কোনই মিল নেই। তবু যেন কি একটা মিল আছে। বিলু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আনিস সাহেব বলছেন, আচ্ছা এখন তোমরা বলতো কোন প্রাণী অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায়।

নিশা বলল, অন্ধকারে শুধু বিড়াল দেখতে পায়।

টগর বলল, বাদুর এবং পেঁচা দেখতে পায়।

'এইসব প্রাণীদের মধ্যে সবচে ভাল কে দেখতে পায়?'

'জানি না বাবা।'

'প্রশ্ন করলেই চট করে জানি না বলা ঠিক না টগর। অনেকক্ষণ প্রশ্নটা নিয়ে ভাববে, তারপরেও যদি না পার তাহলে বলবে–বলতে পারছি না।'

নিশা বলল, আমার মনে হয় অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায় বিড়াল। আমারটা হয়েছে বাবা?

'না হয়নি। অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায় মানুষ। কারণ সে অন্ধকারে বাতি জ্বালানোর কৌশল জানে। অন্য কোন প্রাণী তা জানে না। কাজেই মানুষ অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায়।'

টগর বলল, জোনাকি পোকাওতো অন্ধকারে বাতি জ্বালাতে পারে।

আনিস একটু হকচকিয়ে গেল। টগরের এই উত্তর সে আশা করেনি। আনিস বলল, জোনাকি বাতি জ্বালাতে পারে তা ঠিক। শুধু জোনাকি না অন্ধকারে সমুদ্রের অনেক মাছ যেমন ইলেকট্রিক 'ঈল' বাতি জ্বালাতে পারে। কিন্তু এই বাতি প্রকৃতি তার শরীরে দিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার হলে আপনাতে জ্বলে উঠে। প্রকৃতি মানুষের শরীরে এমন কিছু দিয়ে দেয়নি। বাতি জ্বালানোর কৌশল মানুষকে বুদ্ধি করে বের করতে হয়েছে। জোনাকি পোকা এবং 'ঈল' মাছের সঙ্গে এইখানেই মানুষের তফাৎ।

নিশা বলল, প্রকৃতি কি বাবা?

আনিস আবার হকচকিয়ে গেল। প্রকৃতি কি তার উত্তর তিন ভাবে দেয়া যায়: আস্তিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। নাস্তিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এসকেপিষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে কোনটা দেবে? কোনটা দেয়া উচিত? আনিস বলল, গল্প গুজব আজকের মত শেষ। বাবারা এবার ঘুমুতে যাবার পর্ব। আমি এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে তোমরা পানি খেয়ে বাথরুম পর্ব শেষ করে ঘুমুতে যাবে। এক–দুই–তিন–চার–পাঁচ–ছয় ······

বিলু নিঃশব্দে নীচে নেমে এল। পথে পুতুলের সঙ্গে দেখা। সে ট্রেতে করে চা বিসকিট নিয়ে উপরে উঠছে। আনিসের চা। মনে হচ্ছে আনিসের সঙ্গে এই মেয়েটির এক ধরনের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রায়ই সে উপরে চা নিয়ে আসে। সহজ সম্পর্কের আড়ালে অন্য কিছু নেইতো? বিপত্নীক তৃষিত এই পুরুষ, যৌবনের দুয়ারে এসে দাঁড়ানো সরলা একজন তরুণী। প্রকৃতি কি তার নিজস্ব নিয়মে এদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে না?

'পুতুল।'

'জ্বি আপা।'

'আনিস সাহেবের জন্যে চা নিয়ে যাচ্ছ বুঝি?'

'জ্বি। আপনে আমারে কিছু বলবেন আফা?'

'না কিছু বলব না। তুমি যাও।'

বিলু মুখে বলেছে কিছু বলবে না কিন্তু তার মন চাচ্ছে অনেক সময় নিয়ে পুতুলকে সে গুছিয়ে নারী–পুরুষ সম্পর্কের জটিলতার কথাগুলি বলে। এই জটিলতা ভয়াবহ জটিলতা। মানুষ তার সবটা জানে না। কিছুটা জানে। ভালবাসার মূল কারণগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে শরীর। ভালবাসায় শরীর ছাড়াও অনেক কিছু আছে। সেই অনেক কিছু কি? কেউ কি জানে? আচ্ছা আনিস সাহেব নিজে কি জানেন? তাঁকে দেখেতো মনে হয় তিনি অনেক কিছু জানেন। অনেক কিছু নিয়ে ভাবেন। এইসব নিয়েও নিশ্চয়ই ভেবেছেন। একদিন হুট করে জিজ্ঞেস করে ফেললেই হয়।

বিলু একতলায় নেমে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খানিক হাঁটল। তার মন বেশ খারাপ হয়েছে। কোন কিছুতেই মন বসছে না। ফরিদের ঘরে আলো জ্বলছে। বিলু মামার ঘরে উঁকি দিল।

মেঝেতে কাদের গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ফরিদ শুয়ে আছে বিছানায়। দু'জনকেই খুব চিন্তামগ্ন মনে হচ্ছে। বিলু বলল, কি হয়েছে মামা?

'কিছু হয়নি।'

'মন খারাপ?'

'না।'

'ভেতরে এসে তোমার সঙ্গে কি খানিকক্ষণ গল্প গুজব করা যাবে?

'ইচ্ছা করলে যাবে।'

বিলু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আচ্ছা মামা দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি। একটা ধাঁধার জবাব দাও তো। বলতো প্রাণীদের মধ্যে কোন প্রাণী অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায়?

ফরিদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'মানুষ আর কে? অন্ধকারে মানুষ ফস করে একটা টর্চ লাইট জ্বেলে দেয়। এইসব লো–লেভেল ইন্টেলিজেন্সের কথা–বার্তা আমার সঙ্গে একেবারেই বলবি না।'

'তুমি এত রাগ কেন মামা?'

'রাগ না। মনটা খারাপ।'

'বাবা আবার কিছু বলেছে?'

'হু।'
'কি বলেছে '
'কি হবে এইসব শুনে।'
'বল না শুনি।'
ফরিদ কিছু বলল না। কাদের ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বিলু বলল, বাবা কি অন্যায় কিছু বলেছেন?
অন্যায়তো বটেই। দুলাভাই আমার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে অতি কুৎসিত মন্তব্য করেছেন। দুলাভাই বলেছেন– আমার মাথায় ব্রেইন বলেই কিছু নেই। ব্রেইনের বদলে আমার মাথায় আছে শুধু ডাবের পানি। শুনে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একটা লোক যদি কনটিনিউয়াসলি বলতে থাকে আমার মাথায় কিছু নেই তখন কেমন লাগে বলতো? তারপরেও কথা আছে– আমার মাথায় কিছু নেই ভাল কথা–তাই বলে ডাবের পানি থাকবে কেন? এটাতো অত্যন্ত অপমানসূচক কথা। ডাবের পানি বলায় যত মাইন্ড করেছি– মাথা ভর্তি গোবর বললে এত মাইন্ড করতাম না।
বিলু হেসে ফেলল। ফরিদ ক্ষিপ্ত গলায় বলল, হাসছিস কেন? একজন ভাবছে আমি একটা ডাব–এর মধ্যে হাসি তামাশার কি আছে? না–কি তোরও ধারণা আমি একটা ডাব?
বিলু লজ্জিত গলায় বলল, সরি মামা।
'দুই অক্ষরের একটা শব্দ 'সরি' বললেই সব সমস্যার সমাধান? তুই ভাবিস কি আমাকে?
'মামা তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি এবং তুমি নিজেও তা ভাল করেই জান।'
'পছন্দ করিস আর না করিস–কাল ভোর থেকে তোরা কেউ আমাকে দেখবি না। আমি পথে নেমে যাচ্ছি।'
'পথে নেমে যাচ্ছি মানে?'
'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। বাড়িতে বসে এই অপমান সহ্য করব না। যথেষ্ট সহ্য করেছি। মানুষের সহ্য শক্তির একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করা হয়েছে। দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেছে বিলু।'
কাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অখন দেওয়াল ভাইঙ্গা বাইর হওন ছাড়া আর উপায় নাই আফা।
'তুইও যাচ্ছিস না–কি?
'হু–মামারে একলা ছাড়ি ক্যামনে।'
'ভাল। যা কিছুদিন বাইরে থেকে আয়।'
'ফরিদ পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, এই রাতই এ বাড়িতে আমাদের শেষ রাত। দ্য লাস্ট নাইট।'
ফরিদের কথায় কোন গুরুত্ব এ বাড়িতে কেউ দেয় না। বিলুও দিল না। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা সত্যি সত্যি দেখা গেল ফরিদ এবং কাদের কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছে। সোবাহান সাহেবের সঙ্গে তাদের দেখা হল বারান্দায়। ফরিদ বলল, দুলাভাই চললাম। যদি কোন অপরাধ করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। যদিও জানি তেমন কোন অপরাধ হয়নি।
সোবাহান সাহেব বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

'রাস্তায় আর কোথায়। আমার ঠিকানাতো দুলাভাই রাজপথে। তবে আপনি যদি এখনো নিষেধ করেন তাহলে একটা সেকেন্ড থট দিতে পারি। থেকে যেতে পারি।'

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন–তোমাকে যেতে নিষেধ করব কেন? আমি নিজেইতো তোমাকে যেতে বলেছি।

'তাহলে যাচ্ছি দুলাভাই।

'আচ্ছা।'

'খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।'

'সুন্দর সকাল– তাই না দুলাভাই?'

'হ্যাঁ সুন্দর সকাল।

'তাহলে রওনা দিচ্ছি?'

'আচ্ছা।'

কাদের বলল, বাঁম পাটা আগে ফেলেন মামা। চিরজন্মের মত বাইর হইতে হইলে বাম পা আগে ফেলতে হয়।'

ফরিদ বাঁ পা আগে ফেলল। কুহু কুহু করে একটা কোকিল ডাকছে। এই বাড়ির বাগানে একটা পাগলা কোকিল আছে। বসন্ত কাল ছাড়া অন্য সব সময় সে ডাকে।

কোকিলের ডাকের কারণেই কি–না কে জানে ফরিদের বুক হু হু করতে লাগল। তার মনে হল মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা উচিত হয়নি। তার উচিত ছিল পাখি হয়ে জন্মানো। সেই সব পাখি যারা ঘর বাঁধতে পারে না। যেমন কোকিল। তাহলে ঘর ছাড়ার কষ্টটা পেতে হত না। যার ঘর নেই তার ঘর ছাড়ার কষ্টও নেই। পাগলা কোকিল ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে কুহু কুহু।

আধ ঘন্টার মত হয়েছে।

দু'জন হাঁটছে সমান তালে। এক সময় কাদের শুকনো গলায় বলল, আমরা যাইতেছি কই?

ফরিদ থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত গলায় বলল, কি অদ্ভুত কোইনসিডেন্স। আমিও ঠিক এই মুহূর্তে এই কথাটাই তোকে জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছিলাম।

'আমারে জিগাইলে ফয়দা কি? আমি হইলাম একটা চাকর মানুষ।'

এই কথা ভুলে যা কাদের। এখন আমরা দু'জনই সমান। তুই যা আমিও তা। দু'জনই পথের মানুষ। রাজপথ আমাদের দু'জনকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে।'

'জ্ঞানের কথা অখন আর ভাল লাগতেছে না মামা। ক্ষিধা চাপছে।'

'ক্ষুধা–তৃষ্ণা এইসব স্থূল জিনিস এখন আমাদের ভুলে যেতে হবেরে কাদের। মানিব্যাগ ফেলে এসেছি।'

'কন কি– সাড়ে সর্বনাশের কথা।'

'অবশ্যি নিয়ে এলেও কোন ইতর বিশেষ হত না। মানি ব্যাগে টাকা ছিল না। তোর কাছে কিছু আছে?'

কাদের জবাব দিল না। সে একেবারে খালি হাতে আসেনি। তবে সেই কথা মামাকে বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। ফরিদ বলল, তোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খালি হাতে আসিসনি। দ্যাটস ভেরি গুড। আয় আপাতত চা খাওয়া যাক।

'চা খাইয়া টেকা নষ্ট করনের সার্থকতা কি মামা?'

'চা খেতে খেতে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। রাতে কোথায় ঘুমুব এই নিয়েও ভাবতে হবে।'

'চলেন ফেরৎ যাই।'

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, কি অদ্ভুত কোইনসিডেন্স। আমিও ঠিক এই মুহূর্তে এই কথাটাই বলব বলে ভাবছিলাম। এর ভেতর থেকে যে জিনিসটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হল সেটা কি জানিস?

কাদের বিরস মুখে বলল, জ্বি না।

'যে জিনিসটা স্পষ্ট হল তা হচ্ছে–পথের মানুষ সবাই একই ভাবে চিন্তা করে। ব্যাপারটা আমি চট করে বললাম, কিন্তু যা বললাম তা গভীর দার্শনিক চিন্তার বিষয়। চল চা খাই।'

'চলেন।'

চা খেতে খেতে ফরিদ বলল, যাব কি ভাবে তা নিয়েও চিন্তা করা দরকার। রি এন্ট্রি কি ভাবে হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে।

'ভাবনের কিছু নাই। গিয়া পাও ধরলেই হইব। পাওডাত ধইরা বলতে হইব মাফ চাই।'

'চুপ কর গাধা। পা ধরাধরির কিছুই নেই। গ্রেসফুল এন্ট্রির ব্যবস্থা করছি। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে দে। আরেক কাপ চা দিতে বল–চিনি বেশী। রক্তে ক্যাফিনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ক্যাফিন চিন্তার সহায়ক।'

ফরিদকে আরেক কাপ চা দেয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। কাদের বলল, কিছু পাওয়া গেছে মামা?

'অবশ্যই।'

'কি পাইলেন?'

'পারিবারিক সদস্যদের সাইকোলজি নিয়ে চিন্তা করে বুদ্ধিটা বের করেছি। আমরা চলে আসার পর বাসার পরিস্থিতি কি হয়েছে চিন্তা কর। প্রথমে দুলাভাইয়ের কথা ধরা যাক। উনার অসংখ্য ত্রুটি সত্ত্বেও উনি যে একজন ভালমানুষ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনার মনের অবস্থা কি? উনার মন হয়েছে খারাপ। খুব খারাপ। মনে মনে বলছেন–এই কাজটা কি করলাম? কাজটা ঠিক হয়নি। এর মধ্যে বিলু এসে কান্না কান্না গলায় বলেছে–বাবা, তুমি মামাকে বের করে দিলে? বেচারা এখন কোথায় ঘুরছে কে জানে। বিলু যে এই কথা বলবে তা জানা কথা কারণ মেয়েটা আমাকে খুবই স্নেহ করে। করে না?'

'জ্বি করে। মিনি আফাও করে।'

'ইয়েস। এনাদার প্লাস পয়েন্ট। মিনিও বলবে–বাবা, মামার জন্যে আমার মনটা খারাপ লাগছে। এতে দুলাভাই আরও বিষন্ন হবেন। ক্রমে ক্রমে দুপুর হয়ে গেল খাবার টাইম। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে, আমার অভাব সবাই তীব্রভাবে অনুভব করছে। দুলাভাই, অপরাধবোধে আক্রান্ত। এর মধ্যে তোর অভাবও অনুভব করা যাচ্ছে।'

'সত্যি?'

'অবশ্যই। দোকান থেকে এটা ওটা আনা দরকার। হাতের কাছে কেউ নেই। দুলাভাই তামাক খাবেন–সেই তামাক সাজার কাজটা তোর চেয়ে ভাল কেউ পারে না।'

কাদের হাসি মুখে বলল, কথা সত্য।

'কি বলছি মন দিয়ে শোন। এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ঘরের কলিং বেল বেজে উঠল–ক্রীং ক্রীং ক্রীং। সবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। সবাই ভাবছে আমরা বুঝি চলে এলাম। দরজা খুলে দেখা গেল তুই একা দাঁড়িয়ে আছিস।'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুই। তুই গম্ভীর গলায় বলবি–আমাকে দেখে ভাববেন না যে আমরা ফেরত এসেছি। মামা কঠিন লোক, একবার ঘর থেকে বের হলে সে আর ফেরে না। মামা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসেছি মামার একটা বই নিতে। মামা বই ফেলে গেছেন। তোর কথা শেষ হওয়া মাত্র ঘরে খানিক নীরবতা। বিলু তাকিয়ে আছে বাবার দিকে, মিলি তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। তাদের দৃষ্টিতে নীরব অনুনয় ঝড়ে পড়ছে। দুলাভাই তখন বলবেন, যাই আমি ফরিদকে নিয়ে আসি। দুলাভাই বের হয়ে এলেন এবং হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকবেন। যাকে বলে গ্রেসফুল রিএন্ট্রি। বুঝতে পারলি?'

'পারলাম। আপনের বুদ্ধির কোন সীমা নাই মামা। আরেক কাপ চায়ের কথা কই?'

'আচ্ছা বল।'

কাদের সত্যি সত্যি অভিভূত। এমন অসাধারণ বুদ্ধির একজন মানুষ জীবনে কিছু করতে পারছে না কেন তা ভেবে এই মুহূর্তে সে কিছুটা বিষণ্ন বোধ করছে।

নিরিবিলি বাড়ির গেটের বাইরে ফরিদ হাঁটাহাঁটি করছে। কাদের গিয়েছে বই চাইতে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ফিরে আসতে দেখা গেল। তার মুখ পাংশু বর্ণ।

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যাপার কিরে?

'ব্যাপার কিছু না।'

'যে ভাবে বলতে বলেছিলাম বলেছিলি?'

'হু।'

'দুলাভাই কি বললেন?'

'বললেন–বই নিয়ে বিদায় হ।'

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, বলিস কি?

'যা ঘটনা তাই বললাম। এই নেন আপনের বই।'

কাদেরের হাতে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সবুজ মলাটের আধুনিক কবিতা।'

ফরিদ নীচু গলায় বলল, সমস্যা হয়ে গেল দেখছি।

কাদের কিছু বলল না। তার খুবই মন খারাপ হয়েছে। ঐ ফাজিল কোকিলটা এখনো ডাকছে– কুহু কুহু। রাগে গা–টা জ্বলে যাচ্ছে।

ফরিদ বলল, কাদের কি করা যায় বলত?

কাদের থু করে একদলা থুথু ফেলল। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

'দুপুর এবং রাত এই দু'বেলা খাবারের টাকা কি তোর কাছে আছে?'

'আছে।'

'তাহলে খামাখা এত দুশ্চিন্তা করছি কেন? রাতটা আগে পার করি। তারপর ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কোন পরিকল্পনা বের করতে হবে। আমি এই মুহূর্তে কোন সমস্যা দেখছি না।'

সমস্যা দেখা দিল রাতে। কোন সস্তা দরের হোটেলে রাতটা কাটানো যায় কিন্তু কাদের টাকা খরচ করতে চাচ্ছে না। কতদিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে কে জানে। হাতে কিছু থাকা দরকার। মামার উপর এখন সে আর বিশেষ ভরসা করতে পারছে না। এখন মনে হচ্ছে তার বুদ্ধিটাই ভাল ছিল– পায়ের উপর পড়ে যাওয়া এবং কান্না কান্না গলায় বলা–মাফ করে দেন।

ঠিক হল রাত কাটানো হবে কমলাপুর রেল স্টেশনে। খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুয়ে থাকা। এমন কোন কঠিন ব্যাপার না। তবে মশা একটা বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা

দিতে পারে। পারে বলাটা ঠিক হবে না ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। চারদিকে মশা। স্ত্রী মশারাই কেবল মানুষের রক্ত খায়। কাজেই ধরে নিতে হবে যে মশাগুলি তাকে কামড়াচ্ছে তারা স্ত্রী জাতি ভুক্ত। এদের প্রত্যেককেই বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হচ্ছে। ফরিদের ধারণা ইতিমধ্যে তার শরীর থেকে কোয়ার্টার কেজি'র মত রক্ত পাচার হয়ে গেছে।

'কাদের।'

'জ্বি মামা।'

'মশার হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটা বুদ্ধি বের করেছিরে–কাদের।'

কাদের কিছু বলল না। সে অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করছে। মামার কোন বুদ্ধির উপরই সে এখন আর আস্তা রাখতে পারছে না। ফরিদ উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমরা কি করব জানিস? আমরা মশাদের টাইম দেব। আমরা শোব এমন জায়গায় যেখানে অনেক লোকজন শুয়ে আছে। কিন্তু এখন শোব না। এখন শুধু হাঁটা হাঁটি করব। ধর রাত একটা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে মশারা তাদের প্রয়োজনীয় রক্ত অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখবে। আমরা যখন ঘুমুতে আসব তখন তাদের ডিনার পর্ব শেষ। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা?

'পারছি।'

'সবই বুদ্ধির খেলা বুঝলি। সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে মাথায়। মশা সমস্যার কি সহজ সমাধান করে দিলাম দেখলি?'

'দেখলাম।'

'তোর মনটা মনে হচ্ছে খারাপ।'

'ঘরে বিছানা, মশারি, বালিশ থুইয়া মাটির মধ্যে ঘুম।'

'কিন্তু স্টেশনে গণমানুষের সঙ্গে শুয়ে থাকারওতো একটা আনন্দ আছে। ওদের কাতারে চলে আসতে পারছি এটা কি কম কথা? Have not's দের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আশ্রয়হীনদের দুর্দশা দেখছি। ওদের সুখ দুঃখে অংশ নিচ্ছি–এটাওতো কম না।'

'মামা চুপ করেন তো।'

'তোর মেজাজ মনে হচ্ছে অতিরিক্ত খারাপ। এটাতো ভাল কথা না। জীবনকে দেখতে হবে। জানতে হবে। এদের নিয়ে আমি একটা ছবি করব বলেও ভাবছি। ছবির নাম 'তাহারা'। ছিন্নমূল মানুষদের ছবি। অপেনিং শট থাকবে একটা শিশুর মুখ। ওকি চলে যাচ্ছিস কেন?'

মেঝেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে ঘুমানো যতটা কষ্টকর হবে বলে ভাবা গিয়েছিল ততটা কষ্টকর এখন মনে হচ্ছে না। মাথার নীচে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ দিয়ে ফরিদ বেশ আরাম করেই শুয়েছে–তারপাশে কাদের। কাদের ঘুমিয়ে পড়েছে। ফরিদের ঘুম আসছে না। সে চোখের উপর কবিতার বইটা ধরে রেখেছে। কবিতা পড়তে নেহায়েত মন্দ লাগছে না।

ফরিদের মাথার কাছে এক বুড়ো শুয়েছে। সে স্টেশনেই ভিক্ষা করে। সেও ফরিদের মতই জেগে আছে। এক সময় বলল, ভাইজান কি পড়েন?

ফরিদ বলল, কবিতা।

'এট্টু জোর দিয়া পড়েন–আমিও হুনি।'

'আপনার সম্ভবত ভাল লাগবে না।'

'লাগব। ভাল লাগব।'

'ভাল লাগলে শুনুন, এই কবিতাটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা।

'হিন্দু?'

'জ্বি হিন্দু।'

'মালাউনের কবিতা কি ভাল হইব? আইচ্ছা পড়েন।'

'কবিতার নাম, কাক ডাকে–

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মধ্যে আর মনে–
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠ কা কা!
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা–কিছু নয়,
সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

কবিতা পড়তে পড়তেই ফরিদ ঘুমিয়ে পড়ল। কবিতা পাঠের কারণেই হোক, কিংবা সারাদিনের পরিশ্রমের কারণেই হোক খুব ভাল ঘুম হল। যাকে বলে এক ঘুমে রাত কাবার।

ঘুম ভাঙ্গল কাদেরের চিৎকারে।

'সব্বনাস হইছে মামা– উঠেন।'

ফরিদ উঠল। তেমন কোন সর্বনাশের ইশারা সে দেখল না। কাদের চাপা গলায় বলল, চোর বেবাক সাফা কইরা দিছে।

'সাফা করে দিয়েছে মানে?'

'ভাল কইরা নজর দিয়া দেখেন মামা।'

'আরে তাইতো!'

ফরিদের শান্তিনিকেতনী ব্যাগ নেই। কাদেরের টিনের ট্রাংক নেই। শুধু তাই না, সবচেয়ে যা আশ্চর্যজনক তা হচ্ছে, চোর ফরিদের গা থেকে পাঞ্জাবী এবং কাদেরের শার্ট খুলে নিয়ে গেছে। এই বিস্ময়কর কাজ চোর কি করে করল কে জানে। অত্যন্ত প্রতিভাবান চোর এটা মানতেই হবে। ফরিদ বলল, ভাল হাতের কাজ দেখিয়েছে রে কাদের, I am impressed.

কাদের শুকনো স্বরে বলল, অল্পের জইন্যে ইজ্জত রক্ষা হইছে মামা। টান দিয়া যদি লুঙ্গী লইয়া যাইত তা হইলে উপায়টা কি হইত চিন্তা করেন।

ফরিদ শিউরে উঠল। এই সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আমার পরণে প্যান্ট। ব্যাটা নিশ্চয়ই প্যান্ট নিতে পারত না। কি বলিস কাদের?

'যে শার্ট খুইল্যা নিতে পারে সে প্যান্টও খুলতে পারে।'

'তাওতো ঠিক। মাই গড। আমারতো চিন্তা করেই গায়ে ঘাম দিচ্ছে। কি করা যায় বলতো? রেলওয়ে পুলিশকে ইনফর্ম করব?'

কাদের অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বলল, চুপ করেন তো মামা?

জিন্দেগীতে কোনদিন শুনেছেন পুলিশ চোর ধরছে? আল্লাহতালা পুলিশ বানাইছে ঘুস খাওনের জইন্যে।

'বলিস কি?'

'দেশ থাইক্যা পুলিশ তুইল্যা দিলে চুরি ডাকাতি অর্ধেক কইম্যা যাইব। গরীব একটা কথা কইছে। কথাটা চিন্তা কইরা দেখবেন।'

চোর সবই নিয়ে গেছে তবে কবিতার বই ফেলে গেছে। ফরিদ কবিতার বই হাতে নিল। তবে কবিতা পড়ার ব্যাপারে সে এখন আর কোন আগ্রহ বোধ করছে না। প্রচন্ড ক্ষুধা বোধ হচেছ। খালি পেটে কাব্য, সংগীত এইসব জমে না কথাটা বোধ হয় ঠিকই।

'কাদের।'

'জ্বি মামা।'

'খাওয়া দাওযার কি ব্যবস্থা করা যায় বলতো।

'আর খাওয়া দাওয়া।'

'নাশতা তো খেতে হবে।'

'দুই গেলাস পানি খান। পানি হইল ক্ষিধার বড় অষুধ।'

ফরিদ পর পর তিন গ্লাস পানি খেল। তার ক্ষিধের তেমন কোন উনিশ বিশ হল না।

সোনালী ফ্রেমের চশমা পড়া প্রফেসর টাইপ এক যাত্রী যাচ্ছে। চিটাগাং থেকে এসেছে মনে হচ্ছে। ফরিদ কবিতার বই হাতে এগিয়ে গেল, নরম গলায় বলল, ভাই শুনুন আমার কাছে চমৎকার একটা কবিতার বই আছে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক কবিতা। নাম মাত্র মূল্যে বইটি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি কি আগ্রহী?

লোকটি অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল, জবাব দিল না। তবে ফরিদ পরের এক ঘন্টার মধ্যে বইটি পনরো টাকায় বিক্রি করে ফেলতে সক্ষম হল। বইটি কিনেছে কাল চশমা পরা রূপবতী একজন তরুণী। কাদের তার হ্যান্ডব্যাগ এগিয়ে দিয়েও পাঁচ টাকা পেল।

২২

বিলু এসে বলল, আনিস সাহেব। আপনাকে বাবা একটু ডাকছেন। আনিস লিখছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বিলু বলল, আপনি আপনার কাজ সেরে আসুন। এমন জরুরী কিছু নয়।

আনিস বলল, আমার কাজটাও তেমন জরুরী কিছু না। পত্রিকায় দেখলাম আপনাদের মেডিকেল কলেজ খুলে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ খুলছে। অল্প কিছুদিন ক্লাস হবে আবার বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আপনার, মনে হচ্ছে যাবার খুব একটা ইচ্ছা নেই?'

'না নেই। তাছাড়া বাসায় এলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। আপনার পুত্র-কন্যা কোথায়?'

'ওরা খাটের নীচে।'

'ওখানে কি করছে?'

'জানি না। নতুন কোন খেলা বের করেছে বোধ হয়।'

বিলু নীচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করল। টগরের হাতে কাঁচি। সে কাটাকুটি করছে বলে মনে হয়। চোখে চোখ পড়তেই টগর ইশারায় বিলুকে চুপচাপ থাকতে বলল।

বিলু আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি চলে যান। আমি ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।

'গল্প করতে হলে খাটের নীচে যেতে হবে। ওরা সেখান থেকে বেরুবে বলে মনে হয় না।'

আনিস সার্ট গায়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সোবাহান সাহেবের শরীর বিশেষ ভাল নয়। তিনি চুপচাপ শুয়ে আছেন। আনিসকে দেখে উঠে বসলেন। আনিস বলল, 'কেমন আছেন স্যার?'

'ভাল। তুমি কেমন?'

'আমিও ভাল।'

'বস। ঐ চেয়ারটায় বস। মনটা একটু অস্থির হয়ে আছে।'

'কেন বলুন তো?

'তিনদিন হয়ে গেল ফরিদ বাড়ি থেকে বের হয়েছে আরতো ফেরার নাম নেই। কোন সমস্যায় পড়েছে কিনা কে জানে। ঝোঁকের মাথায় বের করে দিলাম। ভেবেছিলাম এক দু'দিন বাইরে থাকলে বুঝবে পৃথিবীটা কেমন জায়গা। এক ধরনের রিয়েলাইজেশন হবে।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। চিন্তার কিছু নেই। তেমন কোন সমস্যা হলে মামা চলে আসবেন।'

'তাও ঠিক। কোথায় আছে জানতে পারলে মনটা শান্ত হত।'

'আপনি বললে আমি খুঁজে বের করতে পারি।'

'বিশ লক্ষ মানুষ এই শহরে বাস করে। এর মধ্যে তুমি এদের কোথায় খুঁজবে?'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, ঠিকানাহীন মানুষদের থাকার জায়গা কিন্তু খুব সীমিত। ওরা সাধারণতঃ লঞ্চ টার্মিনালে, বাস টার্মিনালে কিংবা ষ্টেশনে থাকে। এই তিনটার মধ্যে ষ্টেশন সবচে ভাল। আমার ধারণা ষ্টেশনে গভীর রাতে গেলেই তাদের পাওয়া যাবে। যদি বলেন, আজ রাতে যাব।

'আমাকে কি নিয়ে যেতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। তবে আপনার যাবার দরকার দেখছি না।'

'আমি যেতে চাই আনিস। ঠিকানাহীন মানুষ কিভাবে থাকে দেখতে চাই।'

'আপনার দেখতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া আপনার শরীরটাও ভাল নেই।'

'আমার শরীর ঠিকই আছে। তুমি আমাকে নিয়ে চল।'

'জ্বি আচ্ছা।

'তোমাকে আর একটা কাজ দিতে চাই। বলতে সংকোচ বোধ করছি।'

'দয়া করে কোন রকম সংকোচ বোধ করবেন না।'

'বিলুর মেডিকেল কলেজ খুলেছে। তুমি ওকে একটু বরিশাল দিয়ে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

অবশ্যি এর মধ্যে যদি কাদের চলে আসে তাহলে ও নিয়ে যাবে। এই কাজটা সাধারণতঃ কাদেরই করে।'

'ষ্টীমারের টিকিট কি কাটা হয়েছে?'

'না-এই কাজটাও তোমাকেই করতে হবে। আমি খুবই অস্বস্থি বোধ করছি।'

আনিস হাসল। সোবাহান সাহেব বললেন, তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই তবু কেন জানি মনে হয় অনেকখানি অধিকার আছে।

'আপনার যদি এরকম মনে হয়ে থাকে তাহলে ঠিকই মনে হয়েছে। স্নেহের অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার আর কি হতে পারে বলুন? সেই অধিকার আপনার ভাল মতই আছে।'

সোবাহান সাহেব হাসলেন।

আনিস বলল, আমি উঠি?

সোবাহান সাহেব বললেন-না না বস। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। তুমি কিছু বল, আমি শুনি।

'কি বলব?'

'যা ইচ্ছা বল। টগর নিশার মা'র কথা বল। বৌমার কথাতো কিছুই জানি না। জানতে ইচ্ছে করে।'

আনিস কিছু বলল না। তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোবাহান সাহেব বললেন, আচ্ছা থাক, ঐ প্রসঙ্গ থাক। আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

সেই নিঃশ্বাসে গাঢ় হতাশা মাখা ছিল। সোবাহান সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আনিস বলল, স্যার উঠি?

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

'রাত বারোটার দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

আনিস চলে গেল। সোবাহান সাহেবের আবারো মনে হল, কি চমৎকার একটি ছেলে। শান্ত, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান। পৃথিবীতে এ রকম ছেলের সংখ্যা এত কম কেন ভেবে তাঁর একটু মন খারাপও হল।

আনিস সোবাহান সাহেবকে নিয়ে বের হয়েছে।

রাত প্রায় বারটা, রাস্তাঘাট নির্জন। আনিস বলল, স্যার আমরা কি রিকশা নেব? না-কি হাঁটবেন?

সোবাহান সাহেব বললেন, চল হাঁটি। হাঁটতে ভাল লাগছে। কোন দিকে আমরা যাচ্ছি?

'কমলাপুর রেল স্টেশনের দিকে।'

'চল।'

কমলাপুর রেল স্টেশনের যে দৃশ্য সোবাহান সাহেব দেখলেন তাঁর জন্যে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন জায়গায় শুয়ে আছে। অতি বৃদ্ধও যেমন আছে, শিশুও আছে। এই তাদের ঘর বাড়ি।

একটি মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চার বয়স সাত দিনও হবে না। বাচ্চাটি 'উঁয়া উঁয়া' করে কাঁদছে। মা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সম্ভবতঃ মার শরীর ভাল না। মুখ ফুলে আছে। চোখ রক্তবর্ণ।

সোবাহান সাহেব বললেন, এইসব কি দেখছি আনিস?

'রাতের ঢাকা শহর দেখছেন।'

'আগে কখনো দেখিনি কেন?'

'আগেও দেখেছেন—লক্ষ্য করেননি। আমাদের বেশীর ভাগ দেখাই খুব ভাসা ভাসা। দেখে একটু খারাপ লাগে, তারপর ভুলে যাই।'

'আমি ওদের কিছু সাহায্য করতে চাই।'

'অল্প কিছু টাকা পয়সায় ওদের কোন সাহায্য হবে না।'

'জানি। তবু সাহায্য করতে চাই। ঐ যে বাচ্চাটা কাঁদছে তার মাকে তুমি এই একশ'টা টাকা দিয়েআস।'

আনিস টাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। মেয়েটি টাকা রাখল কিন্তু কোন রকম উচ্ছাস দেখাল না। যেন এটা তার পাওনা টাকা। অনেক দিন পর পাওয়া গেছে।

সোবাহান সাহেব বললেন, আমার আর হাঁটাহাঁটি করতে ভাল লাগছে না আনিস।

'ওদের খুঁজবেন না?'

'না।'

রিকশায় ফেরার পথে সোবাহান সাহেব বললেন, আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না– আমাদের এই অবস্থা কেন? চিন্তা করে দেখ জাপানীদের সঙ্গে আমাদের কত মিল–ওরাও ছোটখাটো ধরনের মানুষ, আমরাও ছোটখাট। ওরা ভাত খায় আমরাও ভাত খাই। ওদের কোন খনিজ সম্পদ প্রায় নেই, আমাদেরও নেই। ওদের কৃষিযোগ্য জমি যতটুকু, আমাদের তারচেয়েও বেশী। ওদের জনসংখ্যার সমস্যা আছে, আমাদেরও আছে। অথচ ওরা আজ কোথায়, আমরা কোথায়? আমার মনটা এত খারাপ হয়েছে যে, তোমাকে বুঝাতে পারছিনা।

'আমি বুঝতে পারছি স্যার।'

'মনটা খারাপ হয়েছে। খুবই খারাপ হয়েছে।'

রাতে সোবাহান সাহেব ঘুমুতে পারলেন না। নতুন একটি খাতায় "ভাসমান জনগুষ্ঠি এবং আমরা" এই শিরোনামে প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করলেন। দু'লাইনের বেশী লিখতে পারলেন না। একসঙ্গে অনেককিছু মাথায় আসছে। কোনটা ফেলে কোনটা লিখবেন তাই বুঝতে পারছেন না।

২৩

ফরিদের এখন দিন কাটছে চিঠি লিখে। পোস্টাপিসের সামনে সে বল পয়েন্ট নিয়ে বসে। মনি অর্ডার লিখে দেয়, চিঠি লিখে দেয়। মনি অর্ডারে দু'টাকা, এনভেলাপের চিঠি এক টাকা, পোস্ট কার্ড আট আনা।

ফরিদ একা নয়। খুব কম করে হলেও পনেরো বিশজন মানুষ এই করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের একটা সমিতিও আছে– 'পত্র লেখক সমিতি।' শুরুতে সমিতির লোকজন মারমুখো হয়ে ফরিদের দিকে এসেছিল! ফরিদের চেহারা এবং স্বাস্থ্য দেখে পিছিয়ে গেছে। ফরিদ তাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং মধুর স্বরে বলেছে, বেআইনী কোন কাজ আমি করব না ভাইসাহেব। সমিতির সদস্য হব। চাঁদা কত বলুন?

তারা সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। বরং চোখ গরম করে বলে গেছে এই জায়গায় হবে না। অন্য জায়গা দেখেন। পুরান পাগল ভাত পায় না। নতুন পাগল।

অন্য জায়গা দেখার ব্যাপারে ফরিদ কিংবা কাদের কাউকে তেমন উৎসাহী মনে হল না। এই জায়গাই চমৎকার। কাজটাও ভাল। চিঠি লিখতেও তার ভাল লাগে। চিঠি যারা লেখাতে আসে তাদের সঙ্গে অতি দ্রুত ফরিদের ভাব হয়ে যায়। ভাবের একটা নমুনা দেয়া যাক।

খালি গায়ের বুড়ো এক লোক চিঠি লিখাতে এসেছে। বুড়ো বলল–লেহেন পর সমাচার, আমি ভালই আছি।

ফরিদ বলল, পর সমাচার লিখব কেন? পর সমাচার মানেটা কি?

'মানেতো বাবা জানি না।'

'যার কাছে লিখছেন তার নাম কি?'

'লতিফা।'

'আপনার কি হয়?'

'আমার ছোট মাইয়া।'

'তাহলে এইভাবে লিখি–মা মনি লতীফা, তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি আচ্ছা বাবা লেহেন। তারপর লেহেন আমি ভালই আছি তবে তোমাদের জন্য বড়ই চিন্তাযুক্ত।'

ফরিদ বলল,'আমি একটু অন্য রকম করে লিখি? লিখি–আমার শরীর ভালই আছে তবে সারাক্ষণ তোমাদের জন্যে চিন্তা করি বলে মন খুব খারাপ থাকে। লিখব?

'জ্বি জ্বি লেহেন। আপনের মত কইরা লেহেন। এই মেয়ে আমার বড় আদরের।'

'আর কি লিখব বলুন?'

'আপনার মত কইরা লেহেন– ভালমন্দ মিশাইয়া।

ফরিদ তরতর করে লিখে চলে। এক পৃষ্ঠার জায়গায় তিন পৃষ্ঠা হয়ে যায়। সেই চিঠি পড়ে শুনানোর পর বৃদ্ধ বলে, বড় আনন্দ পাইলাম বাবাজী। বড় আনন্দ। মনের সব খাটি কথা লেহা হইছে।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে ফরিদও আনন্দ বোধ করে। তার কাষ্টমারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ে। তবে তার নিয়ম হচ্ছে একদিন চলার মত টাকা উঠে গেলেই লেখালেখি বন্ধ। পার্কের কোন বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা।

এই ব্যাপারটা কাদেরের খুব অপছন্দ। সে চায় লেখালেখি রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলুক। মামার অকারণ আলসেমী তার দু'চোখের বিষ। লিখলেই যখন টাকা আসে তখন এই লোক না লিখে বেঞ্চীতে চুপচাপ শুয়ে থাকবে কেন? ফরিদের এই বিষয়ে যুক্তি খুব পরিষ্কার, যতটুক প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই উপার্জন করতে হবে তার বেশী না। সাধু সন্ন্যাসীরা যে পদ্ধতিতে ভিক্ষা করেন সেই পদ্ধতি। যেই একবেলার মত খাবারের চাল পাওয়া গেল ওম্নি ভিক্ষা বন্ধ।

'আপনের কথার মামা কোন আগাও নাই। মাথাও নাই।'

মহা বিরক্ত হয়ে কাদের সিগারেট ধরায়। ফরিদ ভ্রু কুঁচকে তাকাতেই বলে এমন কইরা চাইয়েন না মামা। অখন আপনের সামনে সিগারেট খাইলে দোষের কিছু নাই। বাড়ির বাইরে আপনেও পাবলিক, আমিও পাবলিক।

'তুই পাবলিক ভাল কথা, আমার ঘাড়ে বসে বসে খাচ্ছিস তোর একটুও লজ্জা সরম নেই? রোজগার পাতির চেষ্টা কর।'

'কী চেষ্টা?'

'রিকশা চালালে কেমন হয়? পারবি না?'

কাদের কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, সৈয়দ বংশের পুলা হইয়া রিকশা চালামু? আপনে কন কি? বংশের একটা ইজ্জত আছে না?

ফরিদ কিছু বলল না। আসলে কথাবার্তা বলার চেয়ে বেঞ্চীতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেই তার ভাল লাগছে। নীল আকাশে সাদা মেঘের পাল। এই সৌন্দর্য এতদিন চোখের আড়ালেই ছিল। ভাগ্যিস সে পথে নেমেছিল। পথে না নামলে কি এই দৃশ্য চোখে পড়ত? পড়ত না।

'মামা?'

'কি'

'চুপচাপ আপনের ঘাড়ে বইস্যা খাইতেও খারাপ লাগে। কি করি কন দেহি।'

'ভেবে কিছু একটা বের কর।'

'ছিনতাই করলে কেমন হয় মামা?'

'কি বললি?'

'ছিনতাই।'

'রিকশা চালানোয় আপত্তি আছে। ছিনতাই এ আপত্তি নেই?'

'রিকশা চালাইলে দশটা লোকে দেখব মামা। আর ছিনতাই করলে জানব কেডা? কেউ না।'

'তুই আমার সাথে কথা বলবি না।'

'কি কইলেন মামা?'

'বললাম যে তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না। No talk কথা বললে চড় খাবি।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তুই আমার সঙ্গে হোটেলে খেতেও আসবি না। চোরদের প্রতি আমার কোন মমতা নেই।'

কাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপরই হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। মনে হল বিশেষ কোন কাজে যাচ্ছে। তার প্রায় মিনিট পনেরো পরে তাকে দৌড়াতে দৌড়াতে এদিকে আসতে দেখা গেল। তার হাতে নতুন একটা ব্রীফ কেইস। পেছনে জনা দশেকের একটি দল। ধর ধর আওয়াজ উঠছে।

ফরিদ ধড়মড় করে উঠে বসল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ব্যাপার কি রে? কাদের হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দৌড় দেন মামা।'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে ফরিদ তৎক্ষণাৎ উঠে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতেই বলল, ব্যাপার কি রে?

'ছিনতাই করেছি মামা।'

'সেকি?'

'চাইয়া দেহেন নতুন ব্রীফকেইস। এখন ধরা পড়লে জানে শেষ করব। আরো শক্তে দৌড় দেন।'

ফরিদ হতভম্ব হয়ে বলল, তুই ছিনতাই করেছিস। আমি দৌড়াচ্ছি কেন?

কাদের দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, পাবলিক বড় খারাপ জিনিস মামা। বড়ই খারাপ। এই দুনিয়ায় পাবলিকের মত খারাপ জিনিস নাই।

বিলু এবং আনিসকে স্টীমারে তুলে দিয়ে এসে সোবাহান সাহেব খবর পেলেন যে থানা থেকে টেলিফোন এসেছে। দু'জন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। তারা বলছে সোবাহান সাহেব তাদের চেনেন। তিনি যদি থানায় আসেন তাহলে ভাল হয়। একটাকে দেখে মনে হচ্ছে গ্যাং লিডার–ইয়া লাস। সোবাহান সাহেব তৎক্ষণাৎ থানায় ছুটলেন। ফরিদ এবং কাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হল।

স্টীমারে প্রথম শ্রেণীর যে কামরাটা রিজার্ভ করা হয়েছে তাতে দু'টি বিছানা। দু'সীটের কামরা দেখে বিলুর মুখ শুকিয়ে গেল। আনিস কি তার সঙ্গে এই কামরাতেই থাকবে? তা কি করে হয়? টিকিট আনিস করেছে। এই কাজটা কি ইচ্ছা করেই করা? ভদ্রলোক কি একবারও ভাবলেন না একজন কুমারী মেয়ের সঙ্গে এক কামরায় সারারাত যাওয়া যায় না। বিলু তার বাবার উপর রাগ করল। বাবার উচিত ছিল, কিভাবে যাওয়া হচ্ছে– এইসব জিজ্ঞেস করা। তিনি তাঁর কিছুই করলেন না। তাদের স্টীমারে উঠিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত নেমে গেলেন।

এখন বিলু কি করবে?

আনিসকে ডেকে বলবে–আমরা দু'জনেতো এক সঙ্গে যেতে পারি না। সেটা শোভন নয়। আপনি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুন। এই কথাও বা কিভাবে বলা যায়?

মানুষটাতো নির্বোধ নয়।

সে এমন নির্বোধের মত কাজ কিভাবে করল? না–কি এই কাজ নির্বোধের নয়। অনেক চিন্তা–ভাবনা করে ঠিক করা?

স্টীমার পাঁচটায় ছাড়ার কথা, ছাড়ল সাতটায়। আনিস জিনিসপত্র রুমে ঢুকিয়ে সেই যে উধাও হয়েছে আর তার দেখা নেই। স্টীমারেই কোথাও আছে নিশ্চয়ই। বিলু ইচ্ছা করলেই তাকে খুঁজে বের করতে পারে। ইচ্ছা করছে না।

স্টীমারে বিলু কখনো ঘুমুতে পারে না। আজকের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে তো ঘুমানোর প্রশ্নই উঠে না। বিলু তিন চারটা গল্পের বই বের করল। জার্নিতে একটা গল্পের বই কখনো পড়া যায় না। কিছুক্ষণ পর পর বই বদলাতে হয়–এখন সে পড়ছে রেমার্কের 'নাইট ইন লিসবন'। নাটকীয় মুহূর্তে সোয়াৎস জার্মানীতে তার স্ত্রীর ঘরে লুকিয়ে আছে। স্ত্রীর বড় ভাই নাৎসী পার্টির সদস্য। আগে সে একবার সোয়াৎসকে কনসানট্রেশান ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল। আবারো ধরা পড়লে মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই। এমন সব নাটকীয় মুহূর্ত তবুও বই–এ মন বসছে না। চাপা এক ধরনের অস্বস্তিতে মন ঢাকা।

'খাওয়া দাওয়া হয়েছে?'

বিলু বই থেকে মুখ তুলল। আনিস দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। বিলু শুকনো গলায় বলল, জ্বি না, এখনো খাওয়া হয়নি।

'রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, খেয়ে নিন। দশটা পাঁচ বাজে।'

'আপনি খাবেন না?'

'আমি খেয়ে নিয়েছি।'

'কোথায় খেলেন? স্টীমারে?'

'জ্বি।'

'আমি কিন্তু সঙ্গে দু'জনের মত খাবার এনেছিলাম।'

'কোন অসুবিধা নেই। আপনি খেয়ে নিন। খাওয়া দাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে শুয়ে ঘুম দিন।'

যে চাপা অস্বস্তি বিলুকে চাড়া দিচ্ছিল তা কেটে গেল। ভাগ্যিস যে নিজ থেকে কিছু বলেনি। বললে খুব লজ্জায় পড়তে হত।

আনিস বলল, এক বেডের কামরা ছিল না বলে দুই বেডের কামরা নিতে হয়েছে। অনেকগুলি টাকা খামখা বেশি গেল। আপনি খাওয়া দাওয়া সেরে নিন। ওদেরকে বলেছি এগারোটার সময় আপনাকে চা দিয়ে যাবে।

'চা?'

'আমি একদিন লক্ষ্য করেছি রাতের খাবারেব পর পর আপনি চা খান, সেই কারণেই বলা।'

'আপনি ঘুমুবেন কোথায়?

'ট্রেন, বাস এবং স্টীমারে আমি ঘুমুতে পারি না। প্লেনের কথা জানি না। প্লেনে কখনো চড়িনি। আমি তাহলে যাচ্ছি।'

বিলুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আনিস চলে গেল। আর ঠিক তখন বিলুর মনে হল এই কামরায় গল্প করতে করতে দু'জন রাতটা কাটিয়ে দিতে পারত। তাতে অসুবিধা কি হত?

কিছুই না। আমরা আধুনিক হচ্ছি কিন্তু মন থেকে সংস্কারের বাঘ তাড়াতে পারছি না। কি মূল্য আছে এইসব সংস্কারের?

বিলু চমকে উঠল, কি সব আজে বাজে কথা সে ভাবছে? তাহলে সে কি মনের কোন গভীর গোপনে আশা করে ছিল আনিস থাকবে এই ঘরে? রাতটা কাটিয়ে দেবে গল্প করতে করতে? ছিঃ কি লজ্জার কথা। এমন একটা গোপন বাসনা তার কি সত্যি আছে? এই লজ্জা সে কোথায় রাখবে? ভাগ্যিস একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের মনের গোপন জায়গাগুলি দেখতে পায় না। দেখতে পেলে পৃথিবী অচল হয়ে পড়তো।

রাতের খাবার বিলু খেতে পারল না। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। টি পটে করে চা দিয়ে গেল এগারোটার দিকে। তখন বিলুর মনে হল দু'জন মিলে এক সঙ্গে বসে চা তো খেতে পারে। এর মধ্যে তো অন্যায় কিছু নেই। এটা হচ্ছে সাধারণ ভদ্রতা। এই সাধারণ ভদ্রতাকে আনিস সাহেব নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভেবে বসবেন না।

বিলু দরজা লক করে আনিসের খোঁজে বের হল।

আনিস দোতলার ডেকে চাদর পেতে চুপচাপ বসে ছিল। তার দৃষ্টি অন্ধকার নদীর দিকে। নদীতে টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে মাছ ধরা নৌকা বের হয়েছে। আকাশের নক্ষত্রের মতো মাছধরা নৌকার আলোগুলির ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে কমছে। আনিসের দৃষ্টিতে আত্মমগ্ন একটা ভাব যা দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে। কি ভাবছে এই মানুষটি? তার স্ত্রীর কথা? কতটুকু ভালবাসতো সে তার স্ত্রীকে? সেই রকম ভাল কি অন্য কাউকে বাসা যায় না? না-কি এক জীবনে মানুষ একজনকেই ভালবাসতে পারে?

আচ্ছা সে যদি এখন আনিসের পাশে গিয়ে বসে তাহলে তা কি খুব অশোভন হবে? সে-কি বসবে তার পাশে? হালকা গলায় বলবে–আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। আপনি কি ভাবছেন?

আনিস সাহেব নিশ্চয় লজ্জা পাওয়া গলায় বলবেন, কিছু ভাবছি নাতো। সে বলবে, কি দেখছেন? তিনি বলবেন, কিছু দেখছি না, তাকিয়ে আছি। সে বলবে, আপনাদের এদিকে খুব হাওয়াতো।

ভেবে রাখা কথাবার্তা কিছুই হলো না। আনিস এক সময় হঠাৎ লক্ষ্য করল বিলু দাঁড়িয়ে। সে উঠে এল। বিলু বলল, আপনার সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে একটু উঠে আসুনতো। আনিস উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কোন সমস্যা হয়েছে না-কি?'

'হ্যাঁ সমস্যা হয়েছে।'

'কি সমস্যা?'

'কেবিনে আসুন তারপর বলব।'

স্টীমারে কেবিনে দু'জন মুখোমুখি বসল। বিলু বলল, আগে চা শেষ করুন তারপর বলছি। ঠান্ডা হয়ে গেছে কি-না কে জানে; অনেকক্ষণ আগে দিয়ে গেছে।

আনিস নিঃশব্দে চা শেষ করল। বিলুর আচার-আচরণ, ভাবভঙ্গি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাকে খানিকটা বিভ্রান্ত, খানিকটা উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বারবার শাড়ির আঁচলে সে কপাল মুছছে। আনিস বলল, ব্যাপার কি বলুন তো?

'বলছি। ব্যাপার কিছু না। আপনাকে চা খাবার জন্যে ডেকেছি। না-কি এক কেবিনে আমার সঙ্গে বসে চা খেতে আপনার আপত্তি আছে?'

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, আপত্তি থাকবে কেন?

'আমাকে এখানে রেখে হুট করে পালিয়ে গেলেন সেই জন্যে বলছি।'

আনিস নিজেও এবার খানিকটা বিভ্রান্ত হল। এই মেয়েটি এ রকম করছে কেন?

বিলু বলল, চুপ করে বসে আছেন কেন? গল্প করুন।

কি গল্প করব?'

'আপনার স্ত্রীর কথা বলুন।'

'তার কোন কথা?'

'আচ্ছা তাঁকে কি আপনি খুব ভালবাসতেন।'

'এখনোবাসি।'

'খুববেশী?'

'হ্যাঁ খুব বেশী।'

'আচ্ছা আপনার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকতো তাহলে আপনি কি আপনার স্ত্রীর জন্যে তাজমহল জাতীয় কিছু বানাতেন?'

'না।'

'না কেন?'

'ভালবাসা খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঢাক ঢোল পিটিয়ে তার প্রচার করার কোন কারণ দেখি না।'

'আচ্ছা আপনাদের বিয়ে কিভাবে হয়?'

'কোর্টে হয়। ওর বাবা মা আমার মত ভ্যাগবন্ডের কাছে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। এদিকে ও নিজেও খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল কাজেই· · · · ·

'আপনি কিছু মনে করবেন না একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি – 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই বাক্যটা আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে প্রথম ব্যবহার করল?'

'আমার স্ত্রী।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। বিয়ের প্রসঙ্গ কে প্রথম তুলল, আপনি না উনি?'

'সেই তুলল। সে খুব লাজুক ধরনের মেয়ে ছিল কিন্তু নিজের কথা বলার ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি।'

বিলু আবারো শাড়ির আঁচল দিয়ে কপাল ঘসল। উদ্বিগ্ন চোখে এদিক ওদিক তাকাল তার পরপরই আনিসকে সম্পূর্ণ হতচকিত করে বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি এবং আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক এটা আমি মনেপ্রাণে চাই। এই কথাগুলি অনেকদিন আমার মনের মধ্যে ছিল বলতে না পেরে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আজ বলে ফেললাম। আপনি যদি আমাকে বেহায়া ভাবেন তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।

আনিস কিছুই বলল না।

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। এত বিস্মিত সে এর আগে কখনো হয়নি।

বিলু মাথা নীচু করে বলল, আপনি যদি এখন চলে যেতে চান চলে যেতে পারেন। আর যদি চান আমরা দু'জনে মিলে সারা রাত গল্প করি তাও করতে পারেন।

আনিস দেখল বিলুর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এই কারণেই সে মাথা নীচু করে বসে আছে।

আনিস বলল, বিলু তোমার কি দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বরিশালে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তাহলে বরিশালে নেমেই আমরা যে কাজটা করব তা হচ্ছে ঐ দু'জনকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিষ্টারের কাছে যাব। কি বল?'

'আচ্ছা।'

'আমার মত অবস্থায় লোকজনকে জানিয়ে পাগড়ি টাগড়ি পরে বিয়ে করার অর্থ হয় না। এইবার তুমি চোখ মুছে আমার দিকে তাকাও তো। কাঁদবার মত কিছু হয়নি। আমার মত একজন অভাজনের জন্যে তোমার মত একটা মেয়ে কাঁদবে তা হতেই পারে না। তাকাও আমার দিকে।'

'না আমি তাকাতে টাকাতে পারব না।'

বিলু বলল, তাকাতে পারবে না কিন্তু জলভরা চোখে তাকাল। এই কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে বিলুকে কি সুন্দর যে দেখাল তা সে কোনদিন জানবে না।

২৪

সোবাহান সাহেব বারান্দায় বসে আছেন। তার কোলে মোটা একটা খাতা যে খাতায় গৃহহীন মানুষদের দুঃখ গাঁথা এবং তার দূরীকরণের নানান পদ্ধতি নিয়ে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছেন। এখন অবশ্যি লিখছেন না। এখন ভাবছেন, তবে খাতা খোলা। মঝে মাঝে চোখ বুলাচ্ছেন। ফরিদ এসে গম্ভীর মুখে পাশে দাঁড়াল। হাজত থেকে বের হয়ে এই প্রথম সে দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। সোবাহান সাহেব বললেন, কিছু বলবে?

'জ্বি।'

'কোন প্রসঙ্গে?'

'ছিনতাই প্রসঙ্গে। দুলাভাই আপনার হয়ত ধারণা হয়েছে ঐ দিনের ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত।'

সোবাহান সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। তোমার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।

'আপনাকে কথা বলতে হবে না। আমি কথা বলব। আপনি শুনবেন।'

'আমি কিছু শুনতেও চাচ্ছি না।'

'ও আচ্ছা।'

ফরিদ বিমর্ষ মুখে ঘরের ভেতর ঢুকল। মিলির সঙ্গে দেখা হল। সে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। এখন তাকে কিছু বললেই সে বলবে, মামা আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি। হাতে একদম সময় নেই। অদ্ভুত এই বাঙালী জাতি। হাতে কোন কাজ নেই তবু সারাক্ষণ ব্যস্ত ভঙ্গি। এই ভঙ্গিটা বাঙালী জাতি কোথায় শিখল কে জানে।

'মিলি।'

'জ্বি মামা।'

'খুব ব্যস্ত?'

'জ্বি না।'

'তাহলে তোর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি ঐ ছিনতাইটা প্রসঙ্গে। তোদের সবার হয়ত ধারণা হয়েছে ঐ দিনকার ঘটনার পেছনে আমার হাত আছে। আসলে তা নেই। ব্যাপারটা হল কি· · · · ·

'মামা আমার তো এখন ক্লাস আছে। ক্লাসে যাচ্ছি।'

'তবে যে বললি–তুই ব্যস্ত না।

'ব্যস্ত না তা ঠিক, ক্লাস আছে তাও ঠিক।'

'ও আচ্ছা তুই তাহলে আমার কথা শোনায় আগ্রহী না?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ মামা।'

'ঐদিনকার ঘটনার মুল নায়ক কাদেরকে আমি শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'খুব ভাল করেছো মামা। শাস্তি দাও। আমি এখন যাই?'

'কি শাস্তি দিচ্ছি সেটা শুনে যা। তোর ইউনিভার্সিটিতো পালিয়ে যাচ্ছে না। এক মিনিট লাগবে। আমি অবশ্যি চেষ্টা করব তার চেয়েও কম সময়ে কাজ সারতে। ধর পাঁচ পঞ্চাশ সেকেন্ড।'

'বল কি বলবে।'

'কাদেরকে মানসিক শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কঠিন মানসিক শাস্তি। তার গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সেখানে লেখা থাকবে –"আমি চোর"। এই অপমান সূচক বিজ্ঞাপন গলায় ঝুলিয়ে সে এক লক্ষবার কানে ধরে উঠবে এবং বসবে। প্রতি উঠবোসের সময় উঁচু গলায় বলবে "আমি চোর"।

'বাহ্ চমৎকার শাস্তি।'

'এখানেও শেষ না। প্রতি রাতে তাকে একটা করে শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হবে। এটা করা হবে আত্মশুদ্ধির জন্যে।'

'এখন যাই মামা? তোমার কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে।'

' শেষ হয়নি।'

'সময়তো শেষ হয়ে গেছে। এক মিনিট চেয়েছিলে, তুমি কথা বলেছ এক মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড। তেত্রিশ সেকেন্ড বেশী নিয়ে নিয়েছ। খোদা হাফেজ।'

মিলি আর দাঁড়ালো না। চট করে চলে এলো বারান্দায়। বারান্দায় পা দিয়েই খানিকটা শংকিত বোধ করল–বাবার হাতে খাতাপত্র। চট করে বলে বসতে পারেন– মা একটু শুনতো কি লিখলাম। মিলি অবশ্যই বলতে পারে আমি ইউনিভার্টিসিতে যাচ্ছি কিছু শুনতে পারব না। কিন্তু বলা সম্ভব না। কারণ সে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে মনসুরের কাছে। বাবার কাছে মিথ্যা বলা সম্ভব না। মিথ্যা কথাগুলি এই মানুষটার সামনে এলেই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

সোবাহান সাহেব মিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছিস? মিলি হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মধুর ভঙ্গিতে হাসল। সোবাহান সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, দু'দিন হয়ে গেল অথচ আনিস আসছে না। ব্যাপারটা কি বলতো?

'দু' এক দিন থেকে, দেখে টেখে আসছে আর কি।'

'তবু চিন্তা লাগছে। আজ না এলে মনে করিস তো–মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রারের বাসায় একটা টেলিফোন করব।'

'আচ্ছা।'

'তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

'মনসুর সাহেবের ফার্মেসিতে যাচ্ছি বাবা।'

'যাচ্ছিস যখন ওকে বলিস আমার সঙ্গে দেখা করতে। জরুরী দরকার আছে।।'

'কি দরকার বাবা?'

'এমদাদ সাহেব তাঁর নাতনীকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। তাঁর ধারণা আমি বললেই হয়। ভদ্রলোকের যখন এত শখ বলে দেখি।'

'বললে লাভ হবে না বাবা। উনি কিছুতেই পুতুলকে বিয়ে করতে রাজি হবেন না।'

'রাজি হবে না কেন? পুতুল মেয়েটাতো বড়ই ভাল। দেখতেও সুন্দর। মেয়েটা গরীব। গরীব হওয়াতো দোষের কিছু না। আমি বুঝিয়ে বললেই রাজি হবে।'

মিলি কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, সামান্য মুখের কথায় যদি মেয়েটার একটা গতি হয় তো মন্দ কি?

'কিছু বলার দরকার নেই বাবা।'

'দরকার নেই কেন তুই আমাকে বুঝিয়ে বল।'

'শেষে রাজি হবে না। মাঝখান থেকে তুমি লজ্জা পাবে।'

'লজ্জার কি আছে? লজ্জার কিছুই নেই। তাছাড়া আমার ধারণা সে রাজি হবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যদি মনে কর সে রাজি হবে তাহলে বলে দেখ।'

'তুই হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেন তাওতো বুঝলাম না।'

মিলি কিছু না বলেই নীচে নেমে গেল। তার মন বেশ খারাপ হয়েছে।

মন আরো খারাপ হল যখন ডাক্তারকে ফার্মেসীতে পাওয়া গেল না। মিলি ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করে একটা চিঠি লিখে এল।

ডাক্তার সাহেব,

আপনাকে না পেয়ে চলে যাচ্ছি। একবার বাসায় আসবেন। বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। তবে দয়া করে বাবার সঙ্গে কথা বলার আগে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। খুব জরুরী।

বিনীতা, মিলি।

মিলি বাসায় ফিরে দেখে কাদেরের শাস্তি পর্ব শুরু হয়েছে। তার গলায় সাইনবোর্ড 'আমি চোর'। সে মহানন্দে উঠবোস করছে। ফরিদ উঠবোসের হিসাব রাখছে। প্রতি পঞ্চাশবার উঠবোসের পর দশ মিনিট বিরতি। মিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এইসব ছেলেমানুষীর কোন মানে হয়? কিন্তু মামাকে এই কথা কে বুঝাবে? এই বাড়ির সব মানুষ এমন পাগল ধরনের কেন?

মিলি মন খারাপ করে নিজের ঘরে ঢুকল। কেন জানি কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ঘর সংসার সব ফেলে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে তার এরকম হয়। ক'দিন ধরে ঘন ঘন হচ্ছে। রহিমার মা ঘরে ঢুকল। তার মুখ ভর্তি হাসি। কাদেরের শাস্তিতে সে বড়ই আনন্দ বোধ করছে।

'আফা আপনেরে বুলায়।'

'কে বুলায়?'

'টগরের আব্বা।'

'উনি এসেছেন?'

'হ।'

'তুমি গিয়ে বল এখন যেতে পারব না। পরে এক সময় যাব।'

জ্বি আচ্ছা'

'আরেকটা কথা শোন, ডাক্তার সাহেব এলেই তুমি আমাকে খবর দেবে।'

রহিমার মা ফিক করে হেসেই সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

মিলি তিক্ত গলায় বলল, হাসলে কেন রহিমার মা?

'বুড়া হইছি তো আফা, মাথার নাই ঠিক। বিনা কারণে হাসি পায় আবার চউক্ষে পানি আয়।'

'ঠিক আছে তুমি যাও।'

রহিমার মা আবার ফিক করে হাসল। তার বড় মজা লাগছে। চোখের সামনে ভাব ভালবাসা দেখতে ভাল লাগে। সে ফরিদের ঘরের দিকে রওয়ানা হল। কাদেরের শাস্তি আরো খানিকক্ষণ দেখা যাক। কাউকে শাস্তি পেতে দেখলেও মন ভাল হয়। কেন হয় কে জানে।

দশ মিনিট শাস্তির পর এখন বিরতি চলছে। বিমর্ষ মুখে এমদাদ বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরেই সে একটা কথা বলতে চাচ্ছিল। সুযোগের অভাবে বলতে পারছিল না। এখন সুযোগ পাওয়ায় মুখ খুলল।

'ভাইজান একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'এই শাস্তিতে চোরের কিছু হয় না। চোরের আসল শাস্তি হইল মাইর। শক্ত মাইর।

ফরিদ বলল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এ আপনি বুঝবেন না।

'ছোট্ট একটা পরামর্শ দেই ভাইজান? রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছা।'

'দিন পরামর্শ।'

'দুই হাতে দশটা দশটা কইরা ইট দিয়া রইদে খাড়া করাইয়া দেন, ইট হাতে লইয়া উঠ বোস।'

'আপনার পরামর্শ শুনলাম। দয়া করে আর কথা বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা'

২৫

তিন তারিখটা মনসুরের জন্যে খুব শুভ।

মিলির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তিন তারিখে। প্রথম যেদিন মিলি তাকে ডাক্তার হিসেবে তাদের বাড়িতে ডাকে ঐ দিনও ছিল তিন তারিখ। নিউম্যারোলজি এই সংখ্যাটি সম্পর্কে কি বলে সে জানে না–তবে কিছু নিশ্চয়ই বলে।

আজ হচ্ছে তিন তারিখ।

সকাল থেকেই মনসুরের মনে হচ্ছিল আজ তার জীবনে বড় কোন ঘটনা ঘটবে। সকালে দাঁত মাজতে মাজতে লক্ষ্য করল দু'টা শালিক কিচির মিচির করছে। খুবই শুভ লক্ষণ, দুই শালিক মানেই হচ্ছে আনন্দ। আনন্দময় কিছু আজ ঘটবেই। দিনটাও চমৎকার। আকাশ ঘন নীল। বাতাসও কেমন জানি মধুর।

মনসুর নাস্তা খেয়েই মিলিদের বাড়ির দিকে রওয়া হল। সাত সকালে ঐ বাড়িতে উপস্থিত হবার জন্যে কোন একটা অজুহাত দরকার। সেই অজুহাতও তৈরী করা হয়েছে। মনসুর গিয়ে বলবে কয়েক দিনের জন্যে দেশের বাড়িতে যাবার আগে দেখা করতে এলাম ইত্যাদি।

নিরিবিলি বাড়ির গেট খুলে ভিতরে ঢোকার সময়ও আরেকটি সুলক্ষণ দেখা গেল। আবারো দু'টি শালিক। আনন্দে মনসুরের বুক টিপ টিপ করতে লাগল। সে মনস্থির করে ফেলল, যে করেই হোক মিলিকে সেই বিশেষ বাক্যটি বলবে। দরকার হলে চোখ বন্ধ করে বলবে–আমি

তোমাকে ভালবাসি। তবে বলার আগে দেখে নিতে হবে কথাগুলি মিলিকেই বলা হচ্ছে, অন্য কাউকে না। রং নাম্বার না হয়ে যায়।

সোবাহান সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক টানছিলেন।

ডাক্তারকে দেখে হাসি মুখে বললেন, কেমন আছ ডাক্তার?

'স্যার ভাল আছি।'

'অনেক দিন আস না এদিকে।'

'খুব ব্যস্ত থাকি আসা হয়ে উঠে না।'

তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে। বস এখানে।'

মনসুর বসল। তার বুক ধক ধক করছে। কি সেই জরুরী কথা?

প্রবন্ধ পড়ে শুনাবেন নাতো? এ ছাড়া আর কি জরুরী বিষয় থাকতে পারে? আজও যদি প্রবন্ধ শুনতে হয় তাহলে সাড়ে সর্বনাশ। শালিক দু'টি এখনো ঘুরছে। লক্ষণ শুভ। একটি যদি উড়ে চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রবন্ধ শুনতে হবে। এখনো উড়ছে না।

'ডাক্তার!'

'জ্বি স্যার।'

'তোমাকে যে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি তা কি তুমি জান?'

মনসুরের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। কথা বার্তা কোন দিকে এগুচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। তার তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে।

'আমি চাই ভাল একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। সুখী হবার জন্যে ভাল একটি মেয়ের পাশে থাকা দরকার।'

মনসুরের হৃদপিন্ড লাফাচ্ছে। কি পরম সৌভাগ্য। স্বপ্ন নাতো আবার? না স্বপ্ন বোধ হয় না। স্বপ্নে ঘ্রাণ পাওয়া যায় না– এইতো তামাকের কড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'আমি তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি। বলতে পারিতো?'

'অবশ্যই পারেন, অবশ্যই।'

'প্রস্তাবটি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলেই আমি মনে করি। কারণ আমি শুনেছি মেয়েটিকে তুমি পছন্দ কর।'

এইসব ক্ষেত্রে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। মনসুর তা পারল না। মনের উত্তেজনায় বলে ফেলল– স্যার আপনি ঠিকই শুনেছেন।

'বিয়ের ব্যাপারে তোমার তাহলে আপত্তি নেই?'

জ্বি না।'

'এদেশের ছেলেদের একটি প্রবণতা হচ্ছে বিয়ের পর স্ত্রীকে অবেহলা করা–আশা করি তুমি তা করবে না।'

'অবশ্যই না।'

'স্ত্রীর পড়াশোনার দিকটিও দেখবে। যেন তাকে পড়াশোনা ছাড়তে না হয়।'

'কোন দিন ছাড়তে হবে না।'

'তোমার কথায় খুশী হলাম। তুমি বস আমি এমদাদ সাহেবকে খবরটা দেই। ভদ্রলোক খুশী হবেন। নাতনীকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছিলেন। মেয়েটি ভাল। তুমি সুখী হবে।'

মনসুরের মুখ থেকে 'কু কু' জাতীয় শব্দ হল। আদি মানুষ গাছের ডালে বসে এই রকম শব্দেই মনের ভাব প্রকাশ করত। প্রাথমিক ধাক্কাটা এই শব্দের উপর দিয়েই গেল। তারপর খুব ঘাম হতে লাগল। সোবাহান সাহেব দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি বস আমি সংবাদটা এমদাদ

সাহেবকে দিয়ে আসি। উনি খুব খুশী হবেন। মনসুর কিছু বলল না। তার ইচ্ছা করল ছুটে পালিয়ে যেতে তাও সে পারছে না। মনে হচ্ছে পেরেক দিয়ে কেউ তাকে চেয়ারের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে।

ডাক্তার পুতুলকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে এই সংবাদ মিলি শুনল এমদাদ সাহেবের কাছে। ডাক্তারকে সে চিঠি লিখে এসেছিল। গাধা ডাক্তার কি চিঠি পড়েনি? মিলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ডাক্তার রাজি হয়েছে?

'ষোল আনার উপরে দুই আনা, আঠারো আনা রাজি।'

'কি বলছেন আপনি?'

'সত্যি কথা বলতেছি ভইন। আইজ হইল মঙ্গলবার সত্য দিবস। সত্য দিবসে মিথ্যা বলি ক্যামনে? এখন তুমি ভইন পুতুলরে একটু সাজায়ে দেও।'

'এখন সাজিয়ে দিতে হবে কেন?'

'ডাক্তার বইসা আছে। পুতুলরে নিয়া ঘুরা ফিরা করবে। একটু রং ঢং আর কি? এতে দোষের কিছু নাই। দু'দিন পরে বিবাহ। বিবাহ না হইলে অন্য কথা ছিল। ভইন একটা ভাল দেইখ্যা শাড়ি পরায়ে দেও। লাল রঙ্গে পুতুলরে মানায় ভাল।'

ডাক্তার যতটা হতভম্ব হয়েছিল। মিলি তারচে বেশী হতভম্ব হল। তার চোখ জ্বালা করছে। গলার কাছে কি যেন আটকে আছে। নিজেকে সামলাতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ হাউমাউ করে কাঁদতে পারলে ভাল লাগত। কাঁদতেও ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করছে ইট ভাঙ্গা মুগুর দিয়ে ডাক্তারের মাথায় প্রচন্ড একটা বাড়ি দিতে।

এমদাদ বলল, তাড়াতাড়ি কর ভইন। পুতুলের মুখে পাউডার একটু বেশি কইরা দিবা। মাইয়া আবার শ্যামলা ধাঁচের। পাউডার ছাড়া এই মাইয়ার গতি নাই।

'পুতুলকে পাঠিয়ে দিন আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।'

'এক্ষণ পাঠাইতেছি।'

'ডাক্তার তাহলে পুতুলকে নিয়ে বেড়াবার জন্যে বসে আছে?'

এমদাদ হাসিমুখে মাথা নাড়ল।

ব্যাপারটা সত্যি নয়। ডাক্তার বসে আছে কারণ এমদাদ তাকে বলেছে—একটু বস, তোমার সাথে সোবাহান সাহেবের জরুরী কথা আছে। ডাক্তার বসে আছে জরুরী কথা শোনার জন্যে।

এমদাদ পুতুলকে সাজিয়ে ডাক্তারের সামনে উপস্থিত করল। হাসিমুখে বলল, সোবাহান সাহেব বলছেন পুতুলকে নিয়া চিড়িয়াখানা দেখাইয়া আনতে। এতে তোমাদের পরিচয়টা ভালো হইব। বিবাহের আগে পরিচয়ের দরকার আছে। আমাদের সময় দরকার ছিল না কিন্তু এখন যুগ ভিন্ন। যে যুগের যে বাতাস।

মনসুর যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল গেটের দিকে। পুতুল তাকে অনুসরণ করল। পুতুলের মুখ হাসি হাসি। তাকে দেখাচ্ছেও চমৎকার। চাপা আনন্দে তার চোখ চিকমিক করছে। মনসুর বলল, 'তুমি চিড়িয়াখানায় যেতে চাও?'

'জ্বি চাই।'

মনসুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। পুতুল বলল, আপনার যেতে ইচ্ছা না করলে যাওয়া লাগবে না।

মনসুর ইতস্ততঃ করে বলল, একটা সমস্যা হয়ে গেছে পুতুল।

পুতুল বলল, আমি জানি।

হতচকিত ডাক্তার বলল, 'তুমি জান?'

'জানব না কেন? আমিতো বোকা না। আমি সবই জানি।'

'কি জান?'

'আমি জানি যে দাদাজানের কথার প্যাচে আপনি রাজি হয়েছেন। আসলে আপনি রাজি না।'

'কি করে বুঝলে?'

পুতুল মুখ নীচু করে বলল, 'আপনি যে এই বাড়িতে মিলি আপারে দেখার জন্যে আসেন সেটাতো সবাই জানে।'

'ও আচ্ছা।'

মনসুরের বুকের উপর চেপে থাকা আধমনি পাথর সরে গেল। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। দুই শালিক দেখা তাহলে পুরোপুরি বৃথা হয়নি। বড় ভাল লাগল পুতুলকে। চমৎকার মেয়ে। মেয়েটা যে এত চমৎকার তা আগে বোঝা যায়নি।

'পুতুল। চল চিড়িয়াখানায় যাই।'

'কেন?'

'কারণ তুমি খুব ভাল একটা মেয়ে। আচ্ছা পুতুল তুমি যে খুব ভাল মেয়ে তা কি তুমি জান?'

পুতুল হাসতে হাসতে বলল, জানি।

পুতুলের এই কথায়ও ডাক্তার বিস্মিত হল। পুতুলকে সে লাজুক ধরনের গ্রাম্য বালিকা হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সে মোটেই লাজুক নয়। কথাও বলছে চমৎকার ভঙ্গিতে।

'পুতুল।'

'জ্বি।'

'দুপুরে আজ আমরা কোন একটা হোটেলে খাব। বিকেলে মহিলা সমিতিতে নাটক দেখব। তোমাকে বাসায় দিয়ে আসব অনেক রাতে।'

'কেন?'

'তোমার দাদাজানকে আমি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিতে চাই। তাছাড়া তোমার সাথে আমি আলোচনাও করতে চাই।

'কি আলোচনা?'

'এই জট থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা।'

বলতে বলতে কি মনে করে যেন মনসুর হেসে ফেলল। সেই হাসি দেখে হাসতে লাগল পুতুল। অনেকদিন সে অকারণে এমন করে হাসেনি। তারা লক্ষ্য করল না যে তাদের অকারণ হাসাহাসি এবং রিকশায় পাশাপাশি বসার পুরো দৃশ্যটি গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে দু'জন। গেটের ফাঁক দিয়ে এমদাদ খোন্দকার এবং দোতলার ছাদ থেকে মিলি। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে এমদাদ খোন্দকারের মুখ চাপা হাসিতে ভরে গেল। মিলির চোখ ভরে গেল জলে। অনেক চেষ্টা করেও সে সেই জল সামলাতে পারল না।

আনিস তার লেখা নিয়ে বসেছিল। নিশা তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল; মিসি খালা কাঁদছে। ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বাবা বড়দের কি কাঁদা উচিত?

আনিস বলল, না উচিত না। তবে মাঝে মাঝে বড়রাও কাঁদে। বড়দের জীবনেও দুঃখ কষ্ট আসে।

'আমি কি উনাকে জিজ্ঞেস করব কেন কাঁদছে?'

'না, তা ঠিক হবে না। ছোটরা কাঁদলে জিজ্ঞেস করা যায়। বড়দের যায় না।'

'উনাকে কাঁদতে দেখে আমারো কাঁদতে ইচ্ছা করছে বাবা।'

'কাঁদতে ইচ্ছা করলে কাঁদ।,

'শব্দ করে কাঁদবো না আস্তে আস্তে কাঁদবো?'

'আমার মনে হয় নিঃশব্দে কাঁদাই ভাল হবে।'

নিশা বিছানায় চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। আজ অনেকদিন পর সে তার লেখার খাতা নিয়ে বসেছে। লেখায় মন বসছে না। এক ঘন্টায় মাত্র দশ লাইন লেখা হয়েছে। এই দশ লাইনে 'তারপর' শব্দটা তিনবার। তার লেখালেখির ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি-না কে জানে। হয়ত যাচ্ছে। আনিস প্রাণপণে চেষ্টা করছে মন লাগাতে– অভ্যেসটা যেন পুরোপুরি চলে না যায়।

নিশা চোখ মুছে বলল, কি করছ বাবা?

'লিখছি।'

'গল্প?'

'হুঁ।'

'বড়দের না ছোটদের?'

'লেখার মধ্যে বড়দের ছোটদের কিছু নেই মা। লেখা সবার জন্যে।'

নিশা মাথা নেড়ে বলল, বড়দের লেখায় প্রেম থাকে। ছোটদের লেখায় থাকে না। তুমি আসলে কিছু জান না।

আনিস এই প্রসঙ্গ পুরোপুরি এড়িয়ে যাবে ঠিক করেও মনের ভুলে জিজ্ঞেস করে ফেলল– প্রেম কি মা?

নিশা মিষ্টি করে হাসল। তার হাসি দেখে মনে হল প্রেম কি তা সে জানে তবে এই বিষয়ে বাবাকে কিছু বলবে না। আনিস গল্প লেখা বন্ধ করে চিঠি লিখতে বসল। খুব চমৎকার করে বিলুকে একটা চিঠি লিখতে হবে। খুব দীর্ঘ চিঠি না। সংক্ষিপ্ত চিঠি– বিলু তুমি চলে এস। চলে এস, চলে এস, চলে এস।

ফরিদ দুপুরে খাওয়া শেষ করে দিবানিদ্রার আয়োজন করছে এমন সময় তার ডাক পড়ল। সোবাহান সাহেব জরুরী তলব পাঠিয়েছেন। ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। দুলাভাইয়ের এমন কোন জরুরী কথা তার সঙ্গে থাকতে পারে না যার জন্যে দুপুরের ঘুম বাদ দিতে হবে। ট্রপিক্যাল কান্ট্রির মানুষদের জন্যে দুপুরের ঘুম যে কত দরকারী তা কাউকে বুঝানো যাচ্ছে না।

'কি ব্যাপার দুলাভাই?'

'বস ফরিদ।'

'অফিস খুলে বসেছেন মনে হচ্ছে। কাগজ পত্রের ছড়াছড়ি।'

সোবাহান সাহেব কিছু বললেন না। নতুন একটা ফাইল খুললেন। কাগজপত্রের স্তূপের সঙ্গে আরো কিছু কাগজপত্র যোগ হল। ফরিদ আতংকিত স্বরে বলল, কিছু পড়ে শোনানোর মতলব করছেন নাতো? আপনার মহৎ কোন রচনা পড়বার বা শুনবার তেমন আগ্রহবোধ করছি না। আশা করি এই সত্য কথাটা বলে ফেলার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

'তোমাকে কিছু পড়ে শোনাব না।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি তা বলার জন্যে কিছু ভূমিকা প্রয়োজন।'

'ভূমিকা বাদ দিয়ে মূল প্রসঙ্গে চলে এলে ভাল হয়। আমার ঘুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমুতে না গেলে আর ঘুম আসবে না। ঘুম ব্যাপারটা মানব জীবনের একটা আনসলভডমিষ্ট্রি।'

সোবাহান সাহেব ফরিদের দিকে একটা সবুজ মলাটের ফাইল এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, এটা পড়। মন দিয়ে পড়।

'কিছু পড়তে পারব না দুলাভাই। মন দিয়ে পড়ারতো প্রশ্নই আসে না। কি বলতে চান সংক্ষেপে বলে ফেলুন।'

'ফরিদ, পড়তে না চাইলেও এটা তোমার ফাইল। তোমার সঙ্গেই থাকবে। এতদিন আমি হেফাজতে রেখেছি।

'এতদিন যখন রেখেছেন এখনো রাখুন। আমার পক্ষে ফাইল রাখা সম্ভব নয়। একটা ফাইলে আমার যাবতীয় পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং মার্কশীট রেখেছিলাম। গত চার বছর ধরে ফাইল মিসিং। আমও গেছে ছালাও গেছে। সার্টিফিকেট গেছে যাক। ফাইলটার জন্যে আফসোস হচ্ছে। সুন্দর ফাইল ছিল।'

সোবাহান সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রচন্ড ধমক দিতে যাচ্ছিলেন নিজেকে সামলে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতি জরুরী একটা কাজ করবেন–মেজাজ ঠান্ডা রাখা দরকার। সোবাহান সাহেবের শ্বশুর ফরিদের বাবা বেশ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জামাইকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন টাকাটা যেন গচ্ছিত থাকে। যদি কোন দিন মনে হয় ফরিদের মাথা ঠিক হয়েছে তাহলেই টাকাটা তাকে দেয়া যাবে। সেই টাকা ব্যাংকের নিরাপদ আশ্রয়ে বেড়ে বেড়ে হুলুস্থুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরিদের মাথা ঠিক হয়েছে এ রকম কোন ধারণা সোবাহান সাহেবের হয়নি। তবু তিনি টাকাটা দিয়ে দিতে চান। সে করুক তার যা করতে মন চায়।

'ফরিদ।'

'জ্বি দুলাভাই।'

'পড়।'

ফরিদ নিতান্ত অনিচ্ছায় পড়ল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখনো সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। কোন লেখাই সে দ্বিতীয়বার পড়ে না। এই লেখাগুলি তাকে দ্বিতীয়বার পড়তে দেখা গেল।

'দুলাভাই, এতো কেলেংকারিয়াস ব্যাপার।'

সোবাহান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'কেলেংকারিয়াস ব্যাপার মানে?'

'একটা স্ল্যাং ব্যবহার করলাম। স্ল্যাংটার মানে হচ্ছে দারুণ ব্যাপার। এই টাকাটা কি সত্যি আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন?'

'হু'।

'আমি যা ইচ্ছা তা করতে পারি?'

সোবাহান সাহেব কিছু বললেন না। ফরিদ চিন্তিত গলায় বলল, এত টাকা দিয়ে কি করব তাইতো বুঝতে পারছি না। আপনি বরং অর্ধেক রেখে দিন– নো প্রবলেম।

'তুমি এখন আমার ঘর থেকে বিদেয় হও'।

'বিদেয় হতে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'টাকার পরিমাণ এখানে কি ঠিকঠাক লেখা? মানে দশমিকের ফোটা এদিক ওদিক হয়নিতো?'

'না। তুমি বহিষ্কার হও।'

'হচ্ছি! কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হয়ে গেল দুলাভাই। আশা করছি ব্যাপারটা স্বপ্ন হলে যখন ঘুম ভাংবে তখন দারুণ একটা শক পাব।'

ফরিদ ঘর থেকে বের হল। প্রথমেই দেখা রহিমার মার সঙ্গে। ফরিদ হাসি মুখে বলল, কেমন আছ রহিমার মা?

'জ্বে মামা ভাল।'

'আমার কাছে তোমার যদি কিছু চাওয়ার থাকে চাইতে পার। আজ যা চাইবে–তাই পাবে। Sky is the limit কি চাও?

রহিমার মা বেশ কিছু সময় ভেবে বলল, পাঁচটা টাকা দেন মামা। ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মানুষের আশা আকাংখা কত সীমিত। যা ইচ্ছা তাই চাইতে বলা হয়েছে। সে চেয়েছে পাঁচটা টাকা। বড় কিছু চিন্তা করার মত অবস্থাও এদের নেই। সব চিন্তা ক্ষুদ্র চিন্তা। অভাব অনটন মানুষের কল্পনাশক্তিকেও সম্ভবতঃ খর্ব করে।

'এই নাও পাঁচ টাকা। তুমি যে কত বড় ভুল করলে তুমি জাননা রহিমার মা। যা চাইতে তাই পাইতে– Sky is the limit.

রহিমার মা দাঁত বের করে হাসল। হাসি না থামিয়েই বলল, তাইলে মামা আরো পাঁচটা টাকা দেন।

ফরিদ আরেকটা পাঁচ টাকার নোট বের করল। রহিমার মা'র মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল।

বসার ঘরে শুকনো মুখে মিলি বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে বড় ধরনের একটা ঝড় বয়ে গেছে। ফরিদ যখন বলল, তুই আমার কাছে কি চাস মিলি? যা কিছু চাইবার তাড়াতাড়ি চেয়ে ফেল–টাইম নেই।

মিলি কঠিন গলায় বলল, তুমি মামা বড় বিরক্ত কর। এখন যাও।

'কিছু চাইবি না?'

'না।'

'এই সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না Once in a life time.'

'প্লীজ যাওতো! প্লীজ।'

'যাচ্ছি। তুই এমন মুখ করে বসে আছিস কেন? মনে হচ্ছে তুই আলফ্রেড হিচককের কোন ছবির নায়িকা।'

এমদাদ খোন্দকারকে যখন জিজ্ঞেস করা হল–আপনার যদি আমার কাছে কিছু চাইবার থাকে তাহলে চাইতে পারেন। যা প্রার্থনা করবেন তাই পাবেন।

এমদাদ খোন্দকার অনেক ভেবে চিন্তে বলল, একখান সিগারেট খাওয়ান বাবাজী, বিদেশী। দেশীটা খাইলে গলা খুসখুস করে।

ফরিদ নিজেই দোকান থেকে এক কাঠি বেনসন এন্ড হেজেস এনে দিল। এমদাদ খোন্দকার গাঢ় স্বরে বলল, বাবাজীর ব্যবহারে প্রীত হইলাম। বড়ই প্রীত হইলাম।

'এমদাদ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আজ আমার মনটা বড়ই প্রফুল্ল। আজ আমি কোন ভিক্ষুককে বড় ধরনের সাহায্য করতে চাই।'

'সাহায্য করলেও লাভ নাই। ভিক্ষুক হইল গিয়া আফনের ভিক্ষুক।'

'সে যেন আর ভিক্ষুক না থাকে সেই চেষ্টাই করা হবে। আমি ঠিক করেছি আগামী এক ঘন্টার ভেতর যে ভিক্ষুক এই বাড়িতে আসবে তাকে দশ হাজার টাকা দেব।'

'বাবাজী কি বললেন?'

'আগামী এক ঘন্টার মধ্যে যে ভিক্ষুক এ বাড়িতে আসবে তাকে দেয়া হবে দশ হাজার টাকা। আমি বেশ কিছু টাকা পেয়েছি। দশ হাজার টাকা এখন কোন ব্যাপারই না। এখন বাজছে দু'টা পাঁচ। তিনটা পাঁচের মধ্যে যে আসবে সেই পাবে।'

হতভম্ব ভাব কাটাতে এমদাদ খোন্দকারের অনেক সময় লাগল। পাগল শ্রেণীর অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় আছে—এই রকম পাগল সে দেখেনি।

'বাবাজী একখান কথা বলি?'

'বলেন।'

'আমিও বলতে গেলে ভিক্ষুক শ্রেণীর। টাকা পয়সা নাই। ঘর বাড়িও নাই। পরান্নভোজী। আমি যদি ভিক্ষুক না হই তা হইলে আর ভিক্ষুক কে?'

'আপনার কথা আসছে না। যারা রাস্তায় থাকে, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা হচ্ছে। ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখুন তিনটা পাঁচ বাজা মাত্রই সময় শেষ।'

অন্যদিন ভিক্ষুকের যন্ত্রণায় ঘরে থাকা যায় না। আজই ব্যতিক্রম হল, ভিক্ষুক এল না। এমদাদ খোন্দকার হাসি মুখে বলল, টাইম শেষ বাবাজী।

ফরিদ বিষণ্নমুখে বলল, তাইতো দেখছি।

রাতে ফরিদ একেবারেই ঘুমুতে পারল না। পুরো রাতটাই বিছানায় জেগে কাটাল। দু'বার মাথায় পানি ঢেলে এল। ছাদে খানিকক্ষণ হেঁটে এল। কোন লাভ হল না। তার মাথার দু'পাশের শিরা দপ দপ করছে, চোখ জ্বালা করছে। বুকে এক ধরনের চাপা ব্যথা অনুভব করছে। ধনী হওয়ার যে এত যন্ত্রণা তা কে জানত?

মিলিও ঘুমুতে পারল না।

সে লক্ষ্য করেছে পুতুল ফিরেছে হাসি মুখে। তার সারা চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। হাতে বড় একটা চকোলেটের টিন। টিন খুলে সবাইকে সে চকোলেট বিলি করেছে। মিলিকে দিতে এসেছিল, মিলি কঠিন স্বরে বলেছে—আমি চকলেট খাই না।

এই কথায় সে ফিক করে হেসে ফেলেছে। সেই হাসি মিলির বুকে শেলের মত বিঁধেছে। এসব কি? কি হচ্ছে এসব? বোঝার উপর শাকের আঁটির মত বড় আপার একটি চিঠিও এসে উপস্থিত—সেই চিঠির ভাব ভাষা সবই যেন কেমন অদ্ভুত—

মিলি,

আমি ভুল করেছি কি-না তা জানি না। হয়ত করেছি। করলেও এ ভুল মধুর ভুল। সব মানুষই তার জীবনে অনেক ভুল করে। কিন্তু আনন্দময় ভুল প্রায় কখনোই করে না। আমি করলাম। তার জন্যে কি তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে···

এই রকম চিঠি লেখার মানে কি? আপা এমন কি ভুল করবে যার জন্যে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর সবাই ভুল করতে পারে, আপা পারে না। তারপরও যদি কোন ভুল করে থাকে তাহলে কি সেই ভুল? ভুলের ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে বলছে না কেন?

২৬

নিরিবিলি বাড়ির সামনে দু'টি আইসক্রীমের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। টগর এবং নিশার জন্যে এই গাড়ি দু'টি হচ্ছে ফরিদের উপহার। তারা আইসক্রীম খেতে চেয়েছে—ফরিদ দু'গাড়ি আইসক্রীম এনে বলেছে, "খাও যত খাবে।' আইসক্রীম খাওয়া চলছে। খানিকটা মুখে দিয়েই— থু করে ফেলে দিয়ে আরেকটি হাতে নিচ্ছে। সারা মেঝেতে আইসক্রীমের স্তুপ। ঠাণ্ডায় দু'জনেরই মুখের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাওয়া বন্ধ হচ্ছে না।

পুতুল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল। তার কেন জানি এই দৃশ্য দেখতে বড় ভাল লাগছে। গভীর আনন্দবোধ হচ্ছে। কে জানে কি এই আনন্দের উৎস। তার নিউ মার্কেটে যাবার কথা ছিল তা না গিয়ে সে দোতলায় আনিসের ঘরে চলে গেল। আনিস মাথা নীচু করে একমনে কি যেন লিখছিল। মাথা না তুলেই বলল, ভেতরে এসো পুতুল।

পুতুল ঘরে ঢুকল। বসল খাটের এক প্রান্তে।

'কেমনআছ?

'ভাল।'

'এমদাদ সাহেব এসেছিলেন, বললেন তোমার না–কি বিয়ে।'

পুতুল কিছু বলল না। আনিস বলল, খবরটার মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে বলে আমার ধারণা। আমি দূর থেকে যতদূর দেখেছি আমার মনে হয়েছে ডাক্তার এবং মিলির বিয়েটাই অবশ্যম্ভাবী। মাঝখান থেকে তুমি কি করে এলে বলতো?

'আমি আসি নাই।'

'তাই না–কি?'

আনিস লেখা বন্ধ করে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মাথা নীচু করে বসে থাকা গ্রাম্য বালিকাটিকে আজ কেন জানি আর গ্রাম্য বালিকা বলে মনে হচ্ছে না।

'পুতুল।'

'জ্বি।'

'এসো চা খেতে খেতে দু'জন খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি।'

পুতুল সঙ্গে সঙ্গে চা বানাতে বসল। আনিস চেয়ারে বসে তাকিয়ে আছে পুতুলের দিকে। সে চায়ের পানি গরম করছে। কেরোসিন কুকারের লালচে আভা এসে পড়েছে তার মুখে। সুন্দর লাগছে দেখতে। একটা মানুষকেই এক‌েক পরিবেশে একেক রকম লাগে।

'পুতুল, তুমি কি টগর এবং নিশার কান্ড দেখেছ? দু'জন দু' গাড়ি আইসক্রীম নিয়ে বসেছে।'

পুতুল কিছু বলল না। মনে হল সে অন্য কিছু ভাবছে। জটিল কিছু যার সঙ্গে টগর নিশার তুচ্ছ কর্মকাণ্ডের কোন মিল নেই। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে সে গভীর সমুদ্রে পড়েছে।

'কিছু ভাবছ পুতুল?'

'জ্বি'।

'নিজের ভাবনার কথা কাউকে বলা ঠিক না। তবু তুমি যদি আমাকে বলতে চাও তাহলে বলতে পার।'

'বলতে চাই। আপনাকে অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারি নাই। আজ বলব।'

'হঠাৎ করে আজ কেন?'

পুতুল এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চায়ের কাপ আনিসের সামনে রাখতে রাখতে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি সারাজীবন আপনার সাথে থাকতে চাই। এই কথাটা আমি অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারি নাই। আজ বললাম। বলে যদি কোন অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করবেন।

পুতুল কিছুক্ষণ সরাসরি অনিসের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। আনিস স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তাকে এই জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে তা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

আজকের সকালটা লেখালেখির জন্যে চমৎকার ছিল। বাচ্চারা পাশে নেই, কেউ হৈ চৈ করছে না। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। বাতাসেও ফুলের মিষ্টি সৌরভ। সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা সকাল অথচ সকালটা এক মুহূর্তেই এলোমেলো হয়ে গেছে।

আনিস ভেবে পেল না কি করা উচিত। সে কি চুপ করে থাকবে? না–কি পুতুলকে ডেকে বুঝিয়ে বলবে? মনে হচ্ছে বুঝিয়ে বলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু কি বলবে সে পুতুলকে? অন্ধ আবেগ কোন যুক্তি মানে না। চুপ করে থাকাই বোধ হয় ভাল। বাচ্চা একটি মেয়ে তার প্রতি এ জাতীয় আবেগ লালন করছে তা বুঝতে তার এত সময় লাগল কেন? অনেক আগেই তো ব্যাপারটা তার চোখে পড়া উচিত ছিল। সেও কি অন্ধ?

'আনিস কি ঘরে আছ?'

আনিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফরিদ মামা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে কেমন যেন বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে, যেন জীবনের ভীত নড়ে গেছে। সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে।

ফরিদ নিষ্প্রাণ গলায় বলল।

'আশাকরি আমার সাম্প্রতিক উত্থানের সংবাদ শুনেছ।'

'জ্বি, শুনেছি।'

'এই উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নানান ধরনের পরিবর্তন আমার মধ্যে হয়েছে। প্রথম পরিবর্তন– কথা বার্তায় প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করছি। কেন করছি সেটা একটা রহস্য। দ্বিতীয় পরিবর্তন রাতে ঘুম হচ্ছে না।'

'ঘুম হচ্ছে না কেন?'

'জানি না কেন। নির্ঘুম রাত পার করছি। গত রাতে ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমালাম তাও ভাল ঘুম হল না। মাঝরাতে স্বপ্নে দেখি আমার ওপর দিয়ে বালু বোঝাই এক ট্রাক চলে গেছে। বাকি রাত আর ঘুম হল না।'

'আপনার মনোজগতে সাময়িক পরিবর্তন হয়েছে। এটা তারই প্রভাব। খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে বলে আমার ধারণা।'

'মোটেই কাটবে না। আমি খুব দ্রুত এই টাকার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। তুমি চিন্তা ভাবনা করে একটা ব্যবস্থা কর যাতে এই টাকাটা কাজে লাগে। আমি আগে যেমন দুলাভাইয়ের ঘাড়ে বসে কাটিয়েছি, ভবিষ্যতেও কারোর না কারোর ঘাড়ে বসেই কাটিয়ে দেব। মিলি আছে বিলু আছে। ওরা আমাকে পছন্দ করে। আমাকে ফেলবে না।'

'আপনি মানুষটা খুব অদ্ভুত মামা।'

'মোটেই অদ্ভুত না। আমি একজন অপদার্থ। অপদার্থ নাম্বার ওয়ান। তবে তার জন্যে আমার মনে কোন খেদ নেই। আমি একজন সুখী মানুষ। সুখী মানুষ হিসেবেই আমি মরতে চাই।'

'আপনারতো মামা অনেক রকম পরিকল্পনা ছিল, সেই সব পরিকল্পনা কাজে লাগান। ছবি বানান, ক্ষুধা নিয়ে ছবি বানাতে চাচ্ছিলেন, মাছ নিয়ে ছবি বানাতে চাচ্ছিলেন। সেই সুযোগ তো এখন আছে।'

ফরিদ মরা গলায় বলল, 'আরে দূর দূর। এইসব করতে প্রতিভা লাগে। আমার কোন প্রতিভা নেই। টাকাটা পাওয়ার পর এই ব্যাপারটা টের পেলাম তার আগে টের পাইনি।

'চা খাবেন মামা?'

'চা দিলে খাব কিন্তু চায়ে কোন স্বাদ পাব না। জগৎটা আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে আনিস। The winter of discontent.'

ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা যাচ্ছে তার এই মানসিক যন্ত্রণা কোন মেকি যন্ত্রণা নয়। আনিস অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল।

পুতুলকে বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক দেখালেও সে যে গত দু'দিন ধরে ক্রমাগত কাঁদছে তা এমদাদ খোন্দকার বুঝতে পারছে কিন্তু রহস্যটা ধরতে পারছে না। তার প্রথম ধারণা হয়েছিল ব্যাটা ডাক্তার বোধ হয় ঐ দিন বেড়াতে নিয়ে আজে বাজে কিছু বলেছে। পুতুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে কিছুই বলেনি। অবশ্যি বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক হলে মেয়েরা কাঁদতে শুরু করে। এটা সে ধরনের কান্নাও হতে পারে। তা যদি হয় তাহলে অবশ্যি ভয়ের কিছু নেই, বরং আনন্দের কথা। পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে পুতুলকে আড়ালে নিয়ে গেল।

'তুই কি জন্যে কাঁদছিসরে পুতুল?'

পুতুল চুপ করে রইল।

'ডাক্তার কিছু বলেছে?'

'না।'

'ডাক্তারকে কি তোর পছন্দ না?'

'আমার মত মেয়ের আবার পছন্দ অপছন্দ কি? তুমি যেখানে বিয়ে দিবা সেইখানে বিয়া হইব।'

'এতক্ষণে একটা ভাল কথা বললি। মনে শান্তি পাইলাম।'

'মনে অশান্তি পাইবা এমন একটা কথা তোমারে এখন বলব দাদাজান।

'কি কথা?'

'ডাক্তার মিলি আপাকে বিয়ে করবে। তুমি এত বুদ্ধিমান, এই সহজ জিনিসটা তুমি বোঝ না?'

'আমারেতো বলল অন্য কথা।'

'বিপদে পড়ে বলেছে। তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

খোন্দকার হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তার হতভম্ব ভাব কিছুতেই কাটছে না। কি বলে এই মেয়ে?

'তুমি বড় বোকা দাদাজান। তুমি বড়ই বোকা।'

পুতুল তার দাদাজানকে বারান্দায় রেখে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে সে এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে। পানির কল ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে যাতে কেউ কান্নার শব্দ শুনতে না পায়। তার কষ্ট জানবে শুধু বহমান জলধারা। তাই ভাল। তার দুঃখ জলে চাপা থাক।

২৭

সোবাহান সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করছিলেন। এই সময় মিলি এসে কিছুক্ষণ বাবার সঙ্গে হালকা গল্প গুজব করে। গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। পিঠ চুলকে দেয়। আজো সে এসেছে। তবে আজ তার মুখ পাথরের মত। বসেছে চেয়ারে। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। মনে হচ্ছে কঠিন কিছু বলবে। সোবাহান সাহেব তরল গলায় বললেন, কেমন আছিসরে মা?

'ভাল আছি বাবা।'

'কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল।'

মিলি এবার বাবার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট গলায় বলল, আমি একজনকে বিয়ে করে ফেলব বলে মন ঠিক করে ফেলেছি বাবা। আমার সব কথা আমি সবার আগে তোমাকে বলি। আজও বললাম। সোবাহান সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন,

'ব্যাপারটা কি বলতো?'

'আমি কষ্ট পাচ্ছি বাবা। আর সহ্য করতে পারছি না।'

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি তোমার চিন্তায়, কাজে-কর্মে কখনো বাধা দেই না। এখনো দেব না। যদি তোমার কোন ছেলেকে সত্যি সত্যি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বিয়ে করবে। ছেলেটা কে?'

'ছেলে নীচে বসে আছে।'

'ও আচ্ছা।'

'এখানে নিয়ে আসব?'

'তার দরকার দেখি না।'

'তাহলে তুমি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নীচে আস।'

'তোর হল কি মা বলতো? তুইতো এ রকম ছিলি না।'

মিলির চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। সে অনেক কষ্টে চোখের পানি সামলে বলল, ছেলেটা সব কিছু জট পাকিয়ে ফেলে বাবা। ভাবে একটা করে আরেকটা। নিজে কষ্ট পায় অন্যকে কষ্ট দেয়। কাজেই আমার মনে হয় বিয়েটা অতি দ্রুত হওয়া দরকার।

'হবে, দ্রুতই হবে।'

'আজ রাতে হলেই ভাল হয় বাবা।'

'তুই কি বলছিস মা?'

মিলির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সোবাহান সাহেব উঠে এসে মেয়ের হাতে হাত রাখলেন। জ্বরে মিলির গা পুড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে কি ভাবে কে জানে। স্বাভাবিকভাবেই যে কথা বলছে তা ভাবাও ঠিক না। কথা বলার ভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু দুইই অস্বাভাবিক। সোবাহান সাহেব মেয়ের হাত ধরে নীচে নেমে এলেন।

ডাক্তার সোফায় বসে আছে। বাড়ির সব সদস্যই উপস্থিত। শুধু তাই না একজন কাজি সাহেবও আছেন। যে কোন কারণেই হোক কাজি সাহেবকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

সোবাহান সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। এত আয়োজন কখন হল, কি ভাবে হল, কেনইবা হল? তিনি কেন কিছু জানেন না?

মনসুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, স্যারের শরীর কেমন?

'ভাল।'

'ব্যাপার কি মনসুর?'

'বিয়ে হচ্ছে স্যার।'

'তাইতো দেখছি। রহস্যটা কি?'

মিনু শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে রহস্য জানতে হবে না। তুমি চুপ করে বস।

মিনু রহস্য ভাঙ্গতে চান না। অতি দ্রুত পুরো ব্যাপারটা ঘটার মূলে তাঁর হাত আছে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে তিনি কি কারণে মিলির ঘরে গেছেন। দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার, মিলি নেই। তিনি ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। মিলির টেবিলে মুখ বন্ধ করা খাম। খামের উপরে লেখা, বাবা ও মা'কে।

তিনি খাম খুলে আৎকে উঠলেন। গোটা গোটা হরফে লেখা – মা আমি কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। বেঁচে থাকা আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। তোমরা আমাকে বিদায় দাও। অন্য কোন সুন্দর ভুবনে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। চিঠি পড়ে তাঁর হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

মিনু খোঁজ নিয়ে জানলেন কিছুক্ষণ আগে মিলি ডাক্তারখানায় গেছে মাথা ব্যাথার অষুধ কিনতে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারখানায় ছুটে গেলেন। ফিরলেন ডাক্তারকে সঙ্গে করে। কাদেরকে পাঠিয়ে মগবাজারের কাজি সাহেবকে আনলেন। সোবাহান সাহেবকে জানানো হল সবার পরে কারণ তাঁর ধারণা ছিল– সোবাহান সাহেব বেঁকে বসবেন।

কাজি সাহেব বললেন, দেন মোহরানা কত ধার্য হল?

মনসুর হড়বড় করে বলল, যা ইচ্ছা ধার্য করেন শুধু আমাকে একটা মিনিট সময় দিন। আমি যাব আর আসব। আমার একটা নতুন পাঞ্জাবী আছে–রাজশাহী সিল্ক। ঐটা গায়ে দিয়ে আসি। আমি যাব আর আসব।

কারোর অনুমতির অপেক্ষা না করেই মনসুর উল্কার বেগে বের হয়ে গেল। রাস্তা পার হবার সময় দু'জন পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে নিজে চলন্ত রিকশার সামনে পড়ে গেল। তার জ্ঞান হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। চোখ মেলে তাকানো মাত্র সে শুনল ফরিদের গলা– মিলি, গাধাটার জ্ঞান ফিরেছে মনে হয়, কষে একটা চড় দে তো।

মনসুর তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলল। অজ্ঞান হবার ভান করাই ভাল। মিলি পাশেই আছে এই আনন্দই যথেষ্ট। শারীরিক কোন কষ্টকেই এখন আর কষ্ট মনে হচ্ছে না। তবে বাঁ হাত ভেঙ্গেছে বলে মনে হচ্ছে। কম্পাউন্ড ফ্রেকচার কি-না কে জানে। হোক যা ইচ্ছা–মিলি পাশে। দু'টা হাত ভেঙ্গে গেলেও ক্ষতি নেই। এতে বরং মিলির সহানুভূতি বেশি পাওয়া যাবে।

রাত দু'টার দিকে হাসপাতাল থেকে মনসুর ভাল আছে খবর পাবার পর সোবাহান সাহেব ঘুমুতে গেলেন। মিনু ঘুমুতে গেলেন না। তিনি জেগে রইলেন। এতবড় একটা সমস্যাতেও তাঁকে খুব একটা বিচলিত মনে হল না। সোবাহান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, মিনু তোমাকে একটা কথা বলি, রাগ করো না।

'বল।'

'মিলি যেমন নিজের বর নিজে পছন্দ করেছে বিলুও কি তাই করবে? তোমার কি মনে হয়?'

মিনু জবাব দিলেন না। সোবাহান সাহেব বললেন, আমার মনে হয় না। বিলু সে রকম মেয়ে না। এই মেয়েটাকে আমি আমার পছন্দের একটা ছেলেব সঙ্গে বিয়ে দেব। আমার ধারণা আমি বললেই সে রাজি হবে।

'ছেলেটা কে?'

'ছেলেটা হল আনিস। বুঝতে পারছি আমার কথা শুনেই তুমি চমকে উঠছ। চমকে উঠারই কথা। বিপত্নীক একটা ছেলে। বয়স বেশি–দু'টা বাচ্চা আছে। তবু–মানে ···· অর্থাৎ ছেলেটাকে আমার খুবই পছন্দ।

মিনু চুপ করে রইলেন। তাঁকে খুব বিচলিত মনে হল না। সোবাহান সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে বিলুকে চিঠিতে আমার মতামতটা জানাই।

মিনু সহজ গলায় বললেন, তোমার মতামত জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। বিলু আনিসকে বিয়ে করে বসে আছে।

'সে কি?'

'ভয়ে কাউকে জানায়নি। আমি আজই জানলাম।'

'আজই জানলে?'

হ্যাঁ।'

'কার কাছ থেকে জানলে?'

'বিলুর কাছ থেকে।'

'বিলু এসেছে না–কি?'

'হু! তোমরা সবাই যখন হাসপাতালে তখন এসেছে। ভয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করছে না।'

'যাও ডেকে নিয়ে আস।'

'ও আনিসের ঘরে আছে। এখন ডাকা ঠিক হবে না।'

'হুঁ! সেটাও কথা।'

'বাতি কি নিভিয়ে দেব? ঘুমুবে?'

'না। বারান্দায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসি। মিনু, আজ কি পূর্ণিমা?'

'জানি না।'

মনে হচ্ছে পূর্ণিমা।

সোবাহান সাহেব বারান্দায় এসে দেখলেন–সত্যি পূর্ণিমা। তিনি মনে মনে বললেন, "এমন চাঁদের আলো। মরি যদি সেও ভাল। সে মরণও স্বর্গ সমান।" অনেকদিন আগে পড়া এই লাইন দু'টি কেন যে তাঁর মনে এল কে জানে।

২৮

ফরিদের টাকা পয়সার একটা বিলি ব্যবস্থা হয়েছে। আনিসের পরামর্শে একটা ট্রাস্টি বোর্ড করা হয়েছে। সেই ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি সোবাহান সাহেব। সদস্য তিনজন–আনিস, ডাক্তার এবং কাদের। কাদেরকে সদস্য করা হয়েছে ফরিদের পিড়াপিড়িতে। সে নিজে ট্রাস্টি বোর্ডে থাকবে না। তবে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাদেরকে রাখতে চায়। ট্রাস্টি বোর্ড ফরিদের

সমস্ত টাকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা এবং যুদ্ধে নিহত প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকদের নাম ঠিকানা সংগ্রহে ব্যয় করবে। একটি বিশাল মিউজিয়াম তৈরী হবে। মিউজিয়ামের নাম 'স্বাধীনতা মিউজিয়াম'। সেই মিউজিয়ামে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ থাকবে। এই ট্রাস্টের একমাত্র কাজ হবে দেশের মানুষদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

ফরিদ এখন তার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে। মহানন্দে আছে। তার মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে। সে পাঁচটা টিয়া পাখি জোগাড় করে তাদের কথা শেখাচ্ছে। কথাটা হচ্ছে "তুই রাজাকার।" এইসব টিয়া পুরোপুরি কথা শিখে গেলে এদের উপহার হিসেবে বিশেষ বিশেষ মানুষদের কাছে পাঠানো হবে। তাঁরাই পাবেন যারা এক সময় রাজাকার ছিলেন। আজ দেশের হর্তাকর্তাদের একজন হয়ে বসে আছেন।

ফরিদের এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে 'প্রজেক্ট রাজাকার।' তবে প্রজেক্টের কাজ ঠিকমত এগুচ্ছে না। প্রথমতঃ পাখিগুলিকে কথা শিখাতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ টাকা পয়সার অভাব। ফরিদ তার সব টাকা পয়সা ট্রাস্টি বোর্ডে দিয়ে দেওয়ায় খুবই বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে। সোবাহান সাহেবের কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করেও কিছু আদায় করতে পারেনি। তবে রহিমার মা তার আজীবন সঞ্চয় ভেঙ্গে মামাকে এক হাজার টাকা দিয়েছে। সেই টাকায় আরো বারটি টিয়া কেনা হয়েছে। পাখির খাঁচা বারান্দায় ঝুলছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরিদ সেই পাখিগুলিকে শুনাচ্ছে–'তুই রাজাকার।' মুখে অবশ্যি বলতে হচ্ছে না। টেপ রেকর্ডারে টেপ করা আছে। টেপ বাজানো হচ্ছে। ফরিদকে এই কাজে সাহায্য করছে পুতুল। আজকাল সে বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। কারণ তার দাদাজান সোবাহান সাহেবের সঙ্গে শহীদদের নাম সংগ্রহের জন্যে গ্রামে–গঞ্জে ঘুরছেন। এই প্রথম তিনি একটি কাজ আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে করছেন। মনে হচ্ছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পেয়েছেন।

পাখিগুলির যত্ন করতে পুতুলের খুব ভাল লাগে। খাঁচায় বন্ধ এই পাখিগুলির সঙ্গে সে হয়ত নিজের জীবনের খানিকটা মিল খুঁজে পায়। মাঝে মাঝে আনিসের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। লজ্জায় সে মাথা নীচু করে ফেলে। আনিস বলে, কেমন আছ পুতুল?

পুতুল তার জবাব দেয় না। মনে মনে বলে–আপনি ভাল থাকলেই আমি ভাল। আপনি সুখী হলেই আমি সুখী। দিনে একবার হলেও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি–এই বা কম কি? এমন সৌভাগ্য ক'জন মেয়ের হয়?

এক মঙ্গলবার ভোরে প্রচন্ড চিৎকার এবং হৈ চৈ–এ নিরিবিলি বাড়ির সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ হল। ফরিদ পাগলের মত চেঁচাচ্ছে। চেঁচানোর কারণ একটি পাখি কথা শিখেছে। পরিষ্কার বলছে–'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।

প্রথম পাখিটি কাকে দেয়া যায়?